চমৎকার

প্রচ্ছদ কাহিনি

৯ঋকাল মুখপত্র | প্রথম সংখ্যা | ২০১৭

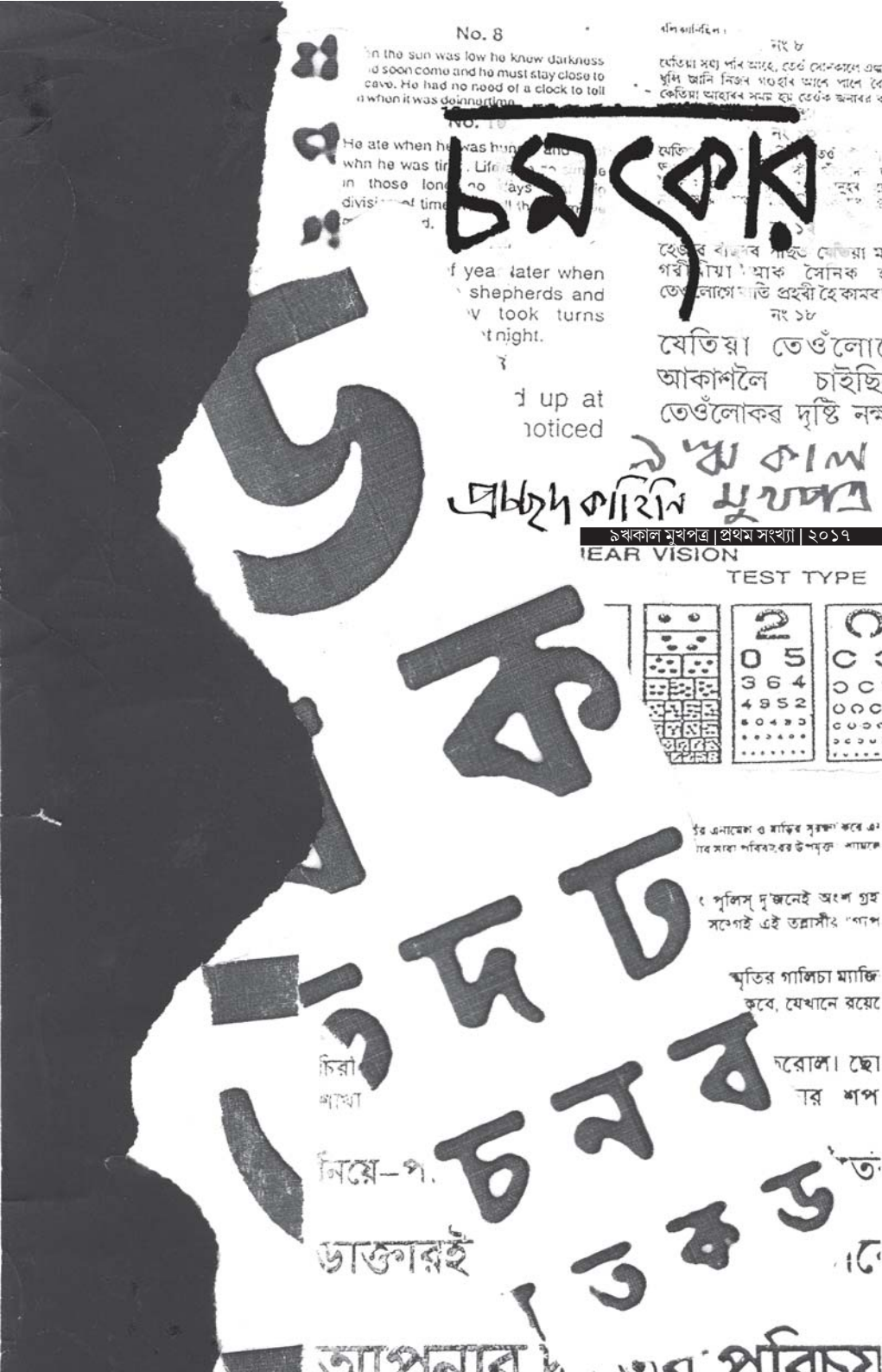

৯ঋকাল মুখপত্র | প্রথম সংখ্যা | ২০১৭

চমৎকার

প্রচ্ছদ কাহিনি

প্রকাশকাল
জানুয়ারি ২০১৭, কলকাতা বইমেলা

প্রকাশক
সামরান হুদা
৯ঋকাল বুকস্
৯/২ বলরাম বোস ঘাট রোড (দ্বিতল), কলকাতা ৭০০ ০২৫
ফোন +৯১ ৯৭৪৮৭৪৭৪৮৭/+৯১ ৯০০৭২৭৫২৪৭
ইমেল lyriqal.books@gmail.com

সম্পাদনা
বিকাশ গণ চৌধুরী

সহযোগী সম্পাদনা
মৌমিতা মহাপাত্র

বিশেষ কৃতজ্ঞতা
আকাদেমি পত্রিকা, সংখ্যা ৩৬, ৩৮, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
নবপত্রিকা, শারদীয়া ১৪১৮
নান্দনিক সময়, একাদশ বর্ষ ২০১৬
প্রমীলা জেসমিন
বাংলা একাডেমি, ঢাকা

প্রচ্ছদ কাহিনি কিউরেশন ও চিত্র সম্পাদনা
প্রণবেশ মাইতি

প্রচ্ছদ
হিরণ মিত্র

হরফ সজ্জা
ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্কোয়ার ইস্ট, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩

হরফ বিন্যাস
সুচরিতা করণ, ৩৮, মহেন্দ্র ভট্টাচার্য রোড, হাওড়া ৪

মুদ্রক
এস পি কমিউনিকেশনস, ৩১ বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৯

দাম ৩০ টাকা

সম্পাদকীয়

নতুন এক প্রকাশ-ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে '৯ঋকাল', যেভাবে বাংলা প্রকাশন বই প্রকাশে অভ্যস্ত সে দস্তুরকে পাশ কাটিয়ে অন্যভাবে সে ভাবছে বই প্রকাশের কথা। প্রত্যেক বইয়ের সঙ্গে থাকছে মূল লেখার সহযোগী আরও কয়েকটি লেখা, মূল লেখার ভুবনটির পরিসর যা পাঠকের কাছে আরও বেশি করে ধরা দিয়ে ছুঁয়ে ফেলতে চাইবে তাঁর প্রত্যাশার দিগন্ত। আর এই ভাবনার প্রতিফলন থাকছে 'চমৎকার', '৯ঋকাল'-এর পুস্তকতালিকাতেও; আমরা চাইছি একটি পুস্তকতালিকাও সংগ্রহযোগ্য হোক, বইয়ের পাশাপাশি সেও থাকুক আমাদের পড়ার টেবিলে কিংবা বইয়ের তাকে, '৯ঋকাল'-এর ছাপা বইয়ের কথা বা খবরের পাশাপাশি থাক বইয়ের জগতের নানান কথা।

এই প্রথম 'চমৎকার' সংখ্যায় আমরা রাখছি বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ-বৃত্তান্ত নিয়ে কয়েকটি লেখা, যেখানে সামগ্রিক ভাবে প্রচ্ছদ নিয়ে আলোচনার মধ্যে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ ভাবনার কথা, আর সেই ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন প্রণবরঞ্জন রায়, প্রণবেশ মাইতি, হিরণ মিত্র; এর পাশাপাশি আলাদা করে থাকছে পূর্ণেন্দু পত্রী আর ধ্রুব এষ কৃত প্রচ্ছদের আলোচনা, থাকছে বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ্ভাবনার দিগন্ত খুলে দেওয়া ব্যক্তিত্ব ডি.কে.-কে নিয়ে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা এক এবং অদ্বিতীয়।

আধুনিক বাংলা বই প্রকাশের সময় বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগ যে নিরাভরণ আবরণের ব্যবহার করেছিল সে বিষয়ে এখানে প্রকাশিত নিবন্ধের লেখকেরা যা লিখেছেন তার সঙ্গে আমি আর একটি দিকে পাঠকের দৃষ্টিপাত করাতে চাই, সেটা হ'ল ১৯১১ সালে শুরু হওয়া ফরাসি প্রকাশনা গালিমারের প্রকাশিত বইয়ের নিরাভরণ প্রচ্ছদের কথা, এই প্রকাশনার হালকা হলুদ রঙের উপর লাল রঙে লেখা বইয়ের নাম, আর কালো রঙে লেখা লেখকের নাম এবং প্রকাশনার লোগা ব্যবহার করা প্রচ্ছদ পরবর্তী সময়ের বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগের প্রায় ওই একই রকমের বিন্যাসের প্রচ্ছদের কথা মনে পড়ায়, এ দুয়ের মধ্যেকার যোগসূত্রের ইতিহাস নিশ্চয়ই আগামীতে কেউ উন্মোচন করবেন...

পাঠককে নমস্কার, পাতা ওল্টান, 'চমৎকার' আপনার পাঠের অপেক্ষায় এবং মতামতেরও; আমাদের দপ্তরের ঠিকানায় বা বৈ-ঠিকানায় সেসব পাঠাবেন, আমরা আশায় রইলাম...

৮ই মাঘ, ১৯২৩ বিকাশ গণ চৌধুরী

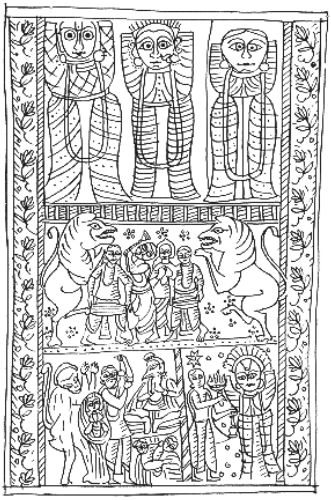

সূচিপত্র

বাংলা বই-এর প্রচ্ছদ - প্রণবরঞ্জন রায় ৭
প্রচ্ছদ ভাবনা - প্রণবেশ মাইতি ১১
প্রচ্ছদের মন, মনের প্রচ্ছদ - হিরণ মিত্র ১৭
এক এবং অদ্বিতীয় - মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫
প্রচ্ছদ শিল্পের কবি পূর্ণেন্দু পত্রী - প্রণবরঞ্জন রায় ৩১
ধ্রুব এষ: দু'বাংলার সালভাদোর দালি - অদ্রীশ বিশ্বাস ৩৯

বাংলা বই-য়ের প্রচ্ছদ

প্রণবরঞ্জন রায়

অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে উনবিংশ শতকের প্রথম চতুর্থাংশ পর্যন্ত, বাংলায়, বাংলা আর রোমান হরফে মুদ্রণযন্ত্রে ছাপা বই- পুস্তিকা ইত্যাদির প্রচ্ছদ থাকলেও সে সবের কোনও দর্শনীয় চরিত্র ছিল না। শুধু বিভিন্ন আকারের হরফ আর বড়জোড় কিছু মুদ্রণযোগ্য নকশাংস সাজিয়ে সেগুলির নির্মাণ হত।

অথচ, ছাপাই বই-জাতীয় পাঠ্য-বস্তু আসার আগে রাঢ়-বরেন্দ্র-বাংলা-সমতট-বরাক-কামরূপ (অসমীয়া ভাষাও একই হরফে লেখা হয়) ভূখণ্ডে, সংস্কৃত, পূর্বী প্রাকৃত, মাগধী, অর্ধমাগধী, সন্ধাভাষা, আদি বাঙ্গালা আর বাঙ্গালা ভাষায় লেখা যত পাঠ্য-বস্তু পুস্তকের মতন করে গ্রন্থিত অবস্থায় পাওয়া গেছে, সে-সব যে সময়েই লিপিবদ্ধ হয়ে থাকুক না কেন, আর তালপাতা বা অন্য যে-ধরনের পাতায় কিংবা কাগজে তা লেখা হয়ে থাকুক না কেন, তার অধিকাংশকেই দুটি কাঠের পাটাতনের চাপে বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গেছে। আর এ-সব পাটার উপরের অংশ, অর্থাৎ পুঁথির প্রচ্ছদ, হত বহুবর্ণ, নকশীকৃত ও চিত্রিত। এসব কাঠের পাটায় চিত্রিত প্রচ্ছদ মধ্যযুগের বাংলার দৃশ্যকলার অন্যতম সম্পদ।

ছাপা বই আসার সঙ্গে মুদ্রণযন্ত্রে ব্যবহারযোগ্য স্থানান্তরক্ষম হরফ আর নকশা-অংশের টাইপ সাজিয়ে লেটারপ্রেসে ছাপা একরঙা বা দু'রঙা (জমির একটি রং আর ছাপা হরফের একটি রং) প্রচ্ছদই রীতি হয়ে ওঠে।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে লিথোগ্রাফি প্রচলন হবার পরে, অল্প সংখ্যায় কিছু বাংলা পত্র-পত্রিকা-পুস্তকের বিম্ব-নকশা- শোভিত চিত্রিত প্রচ্ছদ দেখা যায়, যা লিথোগ্রাফিতে ছাপা। সেগুলি দু'রঙা বা বহুবর্ণ।

বাংলা পুস্তক, পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা প্রকাশনায় আলাদা করে নজরে পড়ার মতন প্রচ্ছদ দেখা যেতে শুরু করে বিংশশতকের দ্বিতীয় দশক থেকে। তার আগে নয়। আর সংস্কৃতি-চর্চার অন্যান্য ক্ষেত্রের মতনই, এ-ক্ষেত্রেও ঠাকুরবাড়ির অগ্রগণ্য ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিচিত্রা, ভারতী, বালক ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা তো ছিলই, তার সঙ্গে ছিল ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের রচিত শিশু আর কিশোর সাহিত্য। এসব পত্র-পত্রিকা, বইয়ের প্রচ্ছদেই প্রথম প্রকাশনার বিষয়বস্তু কিংবা চরিত্র প্রচ্ছদ-পরিকল্পনায় দৃশ্যরূপ পেতে শুরু করে।

সুকুমার রায়/আবোল তাবোল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/দুইবোন

নন্দলাল বসু/পথের দাবী

রামকিংকর বেইজ/ঈশ্বর প্রতিমা

নামাঙ্কন: দ্য পাঞ্জুলিপি প্রেস

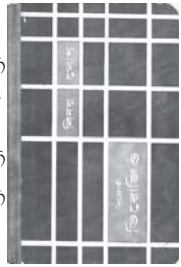

পরিতোষ সেন/ডিস্ট্রোজ্জ

হরেশ আয়াশ দাশগুপ্ত/তত্ত্বাসন্ধানী প্রেস

নামাঙ্কন: প্রায়/ওয়াসান

প্রচ্ছদসহ বাংলা প্রকাশনার সার্বিক সৌষ্ঠব উন্নয়নে যে মুদ্রণকুশল পবিবারের দান অবশ্য উল্লেখযোগ্য তা'হল গড়পারের রায়-পরিবার। পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইউ. রায় এন্ড সন্স-এর ছাপাখানায় তাঁর নিজের রচিত কিশোর-সাহিত্যমূলক বইয়ের যে-সব প্রচ্ছদ নির্মাণ করলেন, তা আজও বিশিষ্ট বইয়ের বিষয়ানুগ ইলাস্ট্রেটিভ প্রচ্ছদের আদর্শস্থানীয়। ইউ.রায় এন্ড সন্স-ই, বাংলা প্রকাশনায়, হাফটোন প্রসেস ব্লক লেটারপ্রেসে ছাপা বহুরঙা প্রচ্ছদ প্রচলন করে। তাঁর জীবদ্দশায় সন্দেশ পত্রিকা ছাড়া তাঁর নিজের লেখা সব বই প্রকাশিত না-হলেও, সুকুমার রায় যে আবোল তাবোল-এর মতন বর্ণনাত্মক আর হ য ব র ল-র জ্যামিতিক-দৃশ্যময় প্রচ্ছদ খসড়া করে বহুরঙা প্রচ্ছদের ধারা সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন শুধু তা নয়, বই নির্মাণের জন্য যে একটি সার্বিক পরিকল্পনা প্রয়োজন তা দেখিয়ে দেন সুকুমার রায়ই।

পাঠ্য-বস্তু হিসাবে বই-পত্র-পত্রিকা-পুস্তিকার প্রাথমিক আকর্ষণ যে আকার, আকৃতি, প্রচ্ছদ, বাঁধাই, হরফের ছাঁদ, হরফের আয়তন, হরফ বিন্যাস, পংক্তি বিন্যাস, পৃষ্ঠা বিন্যাস, চিত্রালঙ্কার বিন্যাস ইত্যাদির মতন দৃষ্টি আকর্ষক গুণের উপর নির্ভরশীল, এ-তত্ত্ব বাংলা প্রকাশনায় সচেতন ভাবে প্রয়োগ শুরু করে পুলিনবিহারী সেনের পরিচালনায় বিশ্ব-ভারতী গ্রন্থণ বিভাগ। পুলিনবিহারীর উদ্যোগে, নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, কানাই সামন্তর প্রচেষ্টায়, মূলত প্রকাশন সংস্থার পরিচয়বহ ছিমছাম সম্ভ্রম-উদ্রেককর প্রচ্ছদ নির্মাণের ধারা প্রবর্তিত হয়। বিশ্ব-ভারতী কোয়ার্টার্লি আর রবীন্দ্রনাথের বই-সহ অজস্র গবেষণাধর্মী পত্র-পত্রিকা-পুস্তক-পুস্তিকার একধরনের নির্বিশেষ সাধারণ প্রচ্ছদপট, আর কখনওবা গ্রন্থের বিষয়-চরিত্রের ইঙ্গিতবহ বিমূর্ত নকশা, হয়ে দাঁড়ালো বিশ্ব-ভারতী প্রকাশনার প্রচ্ছদের চারিত্র্য। বৈচিত্র্য যে থাকত না, তা নয়। ওই একরঙা জমির উপর অন্য একটি সমানুরণধর্মী গাঢ় রঙের নকশি-লিপি কিংবা ছাঁদের অক্ষর-এর ক্ষেত্রবিন্যাসের সমন্বয়ে নির্মিত হত এ-সব প্রচ্ছদ। হাতের লিপির গতিময়তা থেকে বোঝা যেত কোনটি বিনোদবিহারীর, জ্যামিতিক গড়ন থেকে বোঝা যেত কোনটি সুরেণ করের আর চিত্রময় রেখাধর্মীতা দিয়ে চেনা যেত নন্দলালের প্রচ্ছদ।

গত শতকের পঞ্চাশের দশকে এসে দিলীপ গুপ্তর পরিচালনায় সিগনেট প্রেসই বাংলা বইয়ের প্রতিটির বিশিষ্ট বিষয়ের পরিচয়বহ প্রচ্ছদ নির্মাণকে তাদের অভীষ্ট হিসাবে গ্রহণ করে। আর এ-ব্যাপারে দিলীপবাবুকে সহায়তা করেন—বাংলা প্রকাশনার এ-তাবৎকাল পর্যন্ত সবচেয়ে উদ্ভাবনী

নির্মাণশিল্পী, গড় পারের রায়বাড়ি আর বিশ্বভারতীর ঐতিহ্যর আত্মীকরণপটু -- সত্যজিৎ রায়। সত্যজিতের আক্ষেপ ছিল-- কী হস্তলিপিত, কীবা মুদ্রণক্ষম বাংলা হরফের ছাঁদের বৈচিত্র্য বড়ই কম। এবম্বিধ ধারণা থেকে সত্যজিৎ, তাঁর প্রচ্ছদ নির্মাণে বইয়ের বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নানা আয়তনের, নানা আকৃতির, নানা ছাঁদের অক্ষর বিন্যাস করে প্রচ্ছদের নকশা নির্মাণ করেছেন। বইয়ের বিষয়ানুযায়ী কখনও সে নকশা বিবরণাত্বক, কখনও বর্ণণাত্বক, কখনও বা ইঙ্গিতময়--প্রায় বিমূর্ত।

সত্যজিৎ রায়-এর সমসাময়িক খালেদ চৌধুরী ছিলেন বহুপ্রজ প্রায়োগিক শিল্পী। নাটকের মঞ্চসজ্জায় নিবেদিতপ্রাণ এই কুশল-দৃশ্যশিল্পী জীবিকার জন্য পাঠ্যপুস্তকসহ নানা জাতের বইয়ের, নানা ধরনের প্রকাশকের জন্য, প্রচ্ছদ নির্মাণ করে দিয়েছেন। বিচিত্র হবার জন্য এ-চাপ সত্ত্বেও খালেদ চৌধুরী তাঁর প্রচ্ছদ-নির্মাণ কাজে তাঁর নিজস্বতার ছাপ রাখতে পারতেন দুটি গুণে। এক, তাঁর চিন্তন ক্ষমতা;যা তাঁকে দিত বইয়ের বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা করার ও তাকে সহজে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে দৃশ্যমান করার কৌশল। দুই, ছাপাইসহ প্রতিটি দৃশ্যমাধ্যম নিয়ে তাঁর কাজ করার দক্ষতা। তাঁর কাজ দৃশ্যত আত্মবিলোপী হবার পরেও, কৃৎকৌশলগত কারণে আত্মপরিচয়বাহী। তিনি কোনও এক প্রকাশকের পৃষ্টপোষণা নির্ভর ছিলেন না।

সত্যজিৎ যদি হয়ে থাকেন প্রচ্ছদ নির্মাণের সৃষ্টিশীল গদ্যশিল্পী, খালেদ চৌধুরী তবে প্রবন্ধকার, আর পূর্ণেন্দু পত্রী ছিলেন বাংলা প্রকাশনার প্রচ্ছদসৃষ্টির (নির্মাণের নয়) কবি। চাকরিসূত্রে আনন্দ পাব্‌লিসার্স, বন্ধুত্বের টানে দে'জ প্রকাশনীর বইয়ের প্রচ্ছদ, অলংকরণ, গঠন ইত্যাদি বেশি করে থাকলেও, প্রচ্ছদ শিল্পী হিসাবে পূর্ণেন্দুর উত্থান কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল পাব্‌লিশার্স, সাহিত্যপত্র আর নতুন সাহিত্য-র হাত ধরে। পূর্ণেন্দু সৃষ্ট প্রতিটি বইয়ের প্রচ্ছদ নির্মাণ-কল্পনা আলাদা ও বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, নকশার দৃশ্য চরিত্র বিষয়বস্তুর কাল্পনিক চারিত্রনির্ভর হবার কারণে স্রষ্টার পরিচয়বহ হয়ে ওঠে। কল্পনার অগ্রাধিকারই পূর্ণেন্দুর প্রচ্ছদ রচনার মৌলিক গুণ।

বাংলা প্রকাশনার প্রচ্ছদ রচনায় অনেক শিল্পীই তাঁদের গুণপনার ছাপ রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে যেমন যামিনী রায়ের মতন কালজয়ী শিল্পী আছেন, তেমনই আছেন সূর্য রায়ের মতন বিস্মৃত শিল্পীও। কিন্তু যাঁদের সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হল,তাঁরা ছিলেন পথিকৃৎ। প্রত্যেকেই প্রচ্ছদসহ পুস্তক প্রকাশনার এক একটি দিককে এমন

রামেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী/সব পেয়েছির দেশে

গণেশ পাইন/এবং পুরের টিকটিকি

সত্যজিৎ রায়/ক্ষীরের পুতুল

গোপাল ঘোষ/চিহ্ন

কাইয়ুম চৌধুরী/লোকায়ত বাংলা

কাইয়ুম চৌধুরী/মোমেনসাহী গীতিকা

কাইয়ুম চৌধুরী/পৃথক পালঙ্ক

কাইয়ুম চৌধুরী/আবুল হুসেনের রচনাবলী

বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন যে পরবর্তীকালীন নির্মাতা, প্রকাশক আর পাঠকরা তাঁদের প্রবর্তিত গুণগুলিকে ধারা বিবেচনা করতে শুরু করেন— হয়তো অজান্তেই।

আমাদের এ-পশ্চিমবঙ্গ, আসামের বরাক উপত্যকা আর ত্রিপুরাকে একসঙ্গে ধরে যত বাংলা বই, পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি হয় বাংলাদেশ-এ। এ-সব ব্যবহারকারী পাঠকের সংখ্যাও ভারতের চেয়ে বাংলাদেশে বেশি। রাজনৈতিক ইতিহাসও সে-দেশে বাংলাভাষা-চর্চায় অনেক বেশি যত্নের সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং সে-দেশের প্রকাশনা শিল্পে প্রচ্ছদ নির্মাণের উপর আরোপিত গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু জানার কৌতূহল এ-দেশে থাকতেই পারে।

গত শতকের ষাটের দশক থেকেই বাংলাদেশের প্রকাশন শিল্প প্রথমে সাময়িক পত্রের হাত ধরে প্রকাশনার অঙ্গ নির্মাণে অগ্রণী হয়। পরে সে-নির্মাণ ভাবনা-কর্ম পুস্তক-পুস্তিকা-গ্রন্থ পর্যন্ত বিস্তারিত হয়। এ-ব্যাপারে যে-সব প্রকাশন সংস্থা পথিকৃতের ভূমিকা নেয়, তাদের মধ্যে ছিল চট্টগ্রামের বইঘর। শিশু ও কিশোর-পাঠ্য সাময়িক পত্র আর বইয়ের প্রকাশনসূত্রে বইঘর প্রচ্ছদসহ সার্বিক প্রকাশনা নির্মাণে বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠা করে। পরে, দেশের অগ্রণী কবিদের নজর-কাড়া কবিতার বই প্রকাশ করে বৃহত্তর সমাজ-চিত্তে তাঁদের প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন ছড়াকার এখলাসউদ্দিন আহ্‌মেদ।

যে ব্যক্তি— শিল্পীর একক, কিন্তু সহযোগীদের প্রেরণাদায়ী— ব্যবহারিক শিল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের নির্মিত-দৃশ্য দেখার রুচি তৈরি হল, দ্বিমাত্রিক জমিতে নির্মিত-দৃশ্য বিশিষ্ট বাংলাদেশীয় চরিত্র পেল, তিনি সদ্য-প্রয়াত কাইয়ুম চৌধুরী। কাইয়ুম চৌধুরী তাঁর সারা জীবনে নানা প্রকাশন সংস্থার জন্য, নানা জাতের বইয়ের প্রচ্ছদ নির্মাণ করেছেন। সেসব নির্মাণে প্রতিটি বইয়ের বিশিষ্ট চরিত্র চাক্ষুষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতিটি প্রচ্ছদের একমেবাদ্বিতীয়ম নির্মাতাকে শনাক্ত করা দুরূহ নয়। সেটার অন্যতম কারণ বোধ হয় তাঁর বিশিষ্ট/অক্ষর শরীর গঠন শৈলী। এই অক্ষর/হরফ শরীরই আজ বাংলাদেশীয় বাংলা বর্ণমালার বিশিষ্ট ধাঁচে পরিণত। এ কম কথা নয়।

প্রচ্ছদভাবনা

প্রণবেশ মাইতি

একটি বই-এর শরীরীবৃত্তে তার প্রচ্ছদ বা মলাটের ভূমিকাকে কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় না। প্রচ্ছদপটের দীর্ঘ বিবর্তনের প্রারম্ভে প্রচ্ছদ ছিল একান্তভাবে সংরক্ষণকেন্দ্রিক। যে-কোনওভাবে মূল পাণ্ডুলিপি বা মুদ্রিত পাঠকে সংরক্ষণের জন্য এক আবরণ ব্যবহার করা, যাতে করে জীর্ণ না হয়ে পড়ে তার থেকে রক্ষা করা এবং তাকে চিহ্নিত করা। বহু পাণ্ডুলিপি কিংবা মুদ্রিত পাঠের মধ্য থেকে বিশেষটিকে চিনে নেওয়ার জন্য এই চিহ্নিতকরণের প্রয়োজন, আর এই প্রয়োজনের তাগিদে আদিকাল হতে লেখা পুঁথি, তা সে তালপাতা কিংবা হাতে, লেখা হোক, পাণ্ডুলিপিকে সাধারণত লাল শালু কিংবা মোটা কাপড় দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে রাখা হত এবং চিহ্নিতকরণের জন্য সম্ভবত কোনও সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হত— কারণ কাপড়ের উপর কালিকলম দিয়ে সুচারুভাবে কিছু লেখা ছিল কষ্টসাধ্য। এবং সম্ভবত এই পদ্ধতিটিই ছিল প্রচ্ছদপটের আদি সংস্করণ।

১৭৭৮ সালে এই দেশে প্রকাশিত হয়েছিল হ্যালহেড-এর ইংরেজি ভাষায় A Grammar of Bengali Language— যা ছিল আমাদের দেশে প্রকাশিত বিচল হরফে মুদ্রিত প্রথম বই। প্রসঙ্গত এই বই প্রকাশনায় প্রধান সহযোগী ছিলেন একজন বাঙালি কারিগর— নাম পঞ্চানন কর্মকার। এখন এই বইটির প্রচ্ছদ হিসেবে যা আমরা দেখি তা বইটির প্রচ্ছদ না নামপত্র সে-বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা যায় না। ১৮০১ সালে প্রকাশিত রাম রাম বসু রচিত প্রতাপাদিত্য চরিত্র কিংবা উইলিয়াম কেরী কথপোকথন-এর প্রচ্ছদ বাংলা ভাষায় প্রথম শুধু তাই নয় ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত মহাভারত এবং এর দু-বছর পর প্রকাশিত রামায়ণ এর প্রচ্ছদই বা কেমন ছিল এ সম্বন্ধে গবেষকরা নিশ্চিত হয়ে কিছু বলতে পারে না। কারণ এখন যা আমরা দেখি সেগুলি হচ্ছে নামপত্র বা টাইটেল পেজ। শুধুমাত্র এই বইগুলি নয়, ওই সময়ে প্রকাশিত আরও অনেক বই-এর প্রচ্ছদ আমাদের কাছে অন্ধকারে। অপরদিকে ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম সচিত্র বাংলা বই ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল প্রকাশ করেছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। এই বইটিতে ছিল ছয়-টি অলংকরণ। এই অলংকরণগুলি এখনও স্বমহিমায় বিরাজিত। শিল্পী ছিলেন রামচাঁদ রায় ও তাঁর সহযোগী শিল্পীবৃন্দ। কিন্তু বইটির প্রচ্ছদ? এখানেও আমরা অন্ধকারে। কেন-না বই-য়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণের অবস্থানের তারতম্যে। প্রচ্ছদ উন্মুক্ত আর অলংকরণ অন্তঃপুরবাসী। যে-কারণে

রামচাঁদ রায়/অন্নদামঙ্গল

রামকিংকর বেইজ/শান্তিনিকেতনে আশ্রম কন্যা

আশুতোষ ভট্টাচার্য/বাংলার লোকশ্রুতি

শঙ্খ চৌধুরী/ভক্তি গীতিপদ সঞ্চয়ন

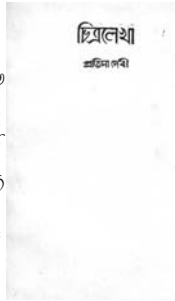

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/চিত্রলেখা

সত্যজিৎ রায়/রাজকাহিনী

মাখন দত্তগুপ্ত/যৌবনবাউল

মনস দে/দুটি পাতা একটি কুঁড়ি

বইয়ের প্রচ্ছদের চেয়ে অলংকরণ অনেক বেশি সুরক্ষিত। অবশ্য একালের প্রকাশনায় প্রচ্ছদের উপর আর-একটি আবরণ প্রচলিত হয়েছে যার নাম জ্যাকেট। যার বয়স দু-তিন দশকের বেশি নয়। কিন্তু বাংলা প্রকাশনার প্রথমার্ধে অধিকাংশ প্রচ্ছদই ছিল মূল বইয়ের ছাপার কাগজের চেয়ে সামান্য ভারী কাগজে– হয়তো বা সামান্য রঙিন, এই রং ছিল সাধারণত ফিকে লাল কিংবা সবুজ/হলুদ। এখানে আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়-এর প্রচ্ছদের কথা মনে করতে পারি। এই সময়ের অধিকাংশ প্রচ্ছদই ভরা ছিল প্রকাশনাসংক্রান্ত কিছু তথ্য দিয়ে। যেমন বইয়ের নাম এবং লেখকের নাম বলা বাহুল্য, সঙ্গে কোন প্রেসে (তখনকার ভাষায়, যন্ত্রে) ছাপা-মুদ্রক-মূল্য ইত্যাদি। যা সাধারণত আমরা এখন প্রিন্টার্স লাইনে দেখতে পাই। গঠনটি ছিল অনেকটা হ্যালহেডের ব্যাকরণের মতো। সবচেয়ে বড়ো টাইপে বই-এর নাম, অপেক্ষাকৃত ছোট টাইপে লেখকের নাম আর অন্যান্য তথ্যগুলি ১২ থেকে ১৪ পয়েন্টের মধ্যে। বর্তমান কালেও এই ধারাকে প্রায়ই বহন করা হয়। বর্তমান কালেও এই ধারাকে প্রায়ই বহন করা হয়। তার মাঝে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের নাম বা শিলমোহর ব্যবহৃত হয়।

সেকালে কিছু সময়ের জন্য বিদেশে তৈরি নানা ধরনের বর্ডার ও টেলপিসের আমদানি হয়েছিল। বর্ডারগুলি সাধারণত বইয়ের প্রচ্ছদে ব্যবহৃত হত। সেগুলির সঙ্গে পাঠ্যবস্তুর সম্পর্ক প্রায় নেই বললেই চলে। এগুলি নিছক অলংকার ছাড়া আর কিছু নয়। ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত উমাচরণ মিত্রর ফারসি থেকে অনূদিত গোলে বকাওয়ালি ১৮৬১ -তে মাইকেল মধুসূদন রচিত কৃষ্ণকুমারী নাটক, ১৮৬৫-তে ব্রাহ্মপাসনা পদ্ধতি। কিংবা ১৯২০ ছয়ি ইউছদ জেলেখা, ১৯৩৯ আবদুল আলি গারুলী ও নিবারণ সুন্দরীর পুঁথি ইত্যাদিতে নতুনত্ব চটক থাকতে পারে হয়তো আকর্ষণীয়, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। তার কারণ সেসময়ে আমাদের বইয়ের প্রচ্ছদ-ধারণা সেভাবে গড়ে ওঠেনি। এরই মধ্যে কিন্তু প্রকাশনাশিল্পে চলে এক প্রতিযোগিতা– কে কত বেশিভাবে পাঠক তথা দর্শকের কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে উপস্থিত হতে পারে। তাই কখনও-কখনও দেখি তুলোর প্যাডের ব্যবহার, রেক্সিন দিয়ে মোড়া বাঁধাইয়ে সোনার জলে বইয়ের প্রচ্ছদ-নাম– আবার চমক দিয়ে ওঠে বহুবর্ণের ছাপাইয়ে গৃহসুন্দরীদের প্রতিকৃতি– কখনও তা এমবস করা। ১৯২১ সালে প্রকাশিত হীরার কণ্ঠী লেখক বিজয়রত্ন মজুমদার। প্রচ্ছদশিল্পীর নাম নেই, ভিতরের ছবি এঁকেছেন প্রখ্যাত সতীশ সিংহ। প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস-গ্রন্থ রাজবাণী, প্রচ্ছদশিল্পীর নাম নেই– এখানে ভিতরের ছবি এঁকেছেন নরেন্দ্রনাথ সরকার ও রবীন্দ্র প্রসাদ দত্ত; প্রকাশকাল ১৯২৫। ১৯২৯ সালে প্রকাশিত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের

স্বামীর ঘর উপন্যাসের প্রচ্ছদ এঁকেছেন নরেন্দ্রনাথ সরকার। শিল্পী নরেন্দ্রনাথ সরকার, রবীন্দ্রনাথ দত্ত সেকালের খুব জনপ্রিয় শিল্পী। এরা বহু বহু বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন এবং এই দায়িত্ব ছাড়াও সেকালের প্রকাশক সংস্থার যেমন এক-এক একটি সাহিত্যগোষ্ঠী ছিল, তেমনই ছিল এক শিল্পীগোষ্ঠীও। এই শিল্পীগোষ্ঠীর মাথায় থাকতেন এক নামি দামি শিল্পী– যেমন নরেন্দ্রনাথ সরকার, হেমেন্দ্র মজুমদার, শীতল বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁদের সৃষ্ট প্রচ্ছদগুলি ছিল এক কথায় বলা যায়, খুব ঝকঝকে এবং চকচকে– পাঠকদের নজর কাড়ত, তার বেশি কিছু নয়। অন্তত একালের চোখে। তবে অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই তৎকালীন প্রকাশক ও শিল্পীদের আন্তরিকতার অভাব ছিল না তবে ব্যতিক্রম ছিল না তা নয়। এ প্রসঙ্গে দুটি বই-য়ের প্রচ্ছদের কথা বলা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষপ্রান্তে একটি কাব্যগ্রন্থের নাম 'ছিন্নলতা', লেখক রাজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশকাল ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ। প্রচ্ছদ পরিকল্পনাটি ছিল সামান্য ভারী হালকা সবুজ কাগজের উপর চারিদিকে ডবল লাইনের সরু রুল মধ্যিখানে বই-য়ের নাম ছিন্নলতা। এই ছিন্ন ও লতা মধ্যিখানে এসে পড়ে লতার একটি টুকরো। এখানে বিষয়বস্তুর সঙ্গে নামলিপিকে একসূত্রে নিয়ে আসার একটি সফল প্রচেষ্টা। আর-একটি বইয়ের প্রচ্ছদ না নামপত্র সঠিকভাবে বলা যায় না। ১৯০২-এ প্রকাশিত রাধাবিনোদ হালদার প্রণীত পাশ করা মাগ একটি প্রহসন প্রচ্ছদে একটি বিবসনা নারীমূর্তি– নীচে লেখা স্ত্রী-স্বাধীনতার এই ফল– পতি হয় পায়ের তল। এখানে প্রচ্ছদ পরিকল্পনা আর যাই হোক বিষয়বস্তুর আভাস আপনি পেয়ে যাচ্ছেন যা সেকালের প্রচ্ছদে প্রায় অনুপস্থিত।

আমাদের মতন দেশে প্রকাশনা যে একটি বিশেষ শিল্পমাধ্যম তা প্রথমে আমাদের নজরে আনে বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগ। ১৯২৩ সালে সেই সূচনার পরিপূর্ণ রূপ আমরা দেখি পূরবী প্রকাশে তার নিরাভরণ এক আবরণে। বইয়ের নাম আর লেখকের নাম সাধারণ মেজ কাগজে একটিমাত্র রঙে। সেই আরম্ভ। এর পর একে একে এসেছে মহুয়া, বনবাণী, চার অধ্যায়, স্ফুলিঙ্গ, দুই বোন এখানে কান্ডারি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সঙ্গে পুলিন সেন, কানাই সামন্ত, প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ কিশোরীমোহন সাঁতরার মতন দিকপালেরা। রবীন্দ্র-পরিবেশে তাঁরা শিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন এক বিশেষ পরিশীলিত ও পরিমিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। এই স্নিগ্ধ সৌন্দর্যবোধগুলি– যা আমাদের মধ্যে সম্ভ্রমবোধ জাগিয়ে তোলে। এভাবে ঠিক বর্ণনা করা যায় না– এক অনুভবের ব্যাপার। তুলনা যদি করি 'বেনারসি' নয়, বাংলার তাঁতের শাড়ির কথাই মনে আসে– সেই পরনে ঢাকাই শাড়ি কপালে সিঁদুর। এক্কেবারে ঘরোয়া। আর সময়বিশেষে

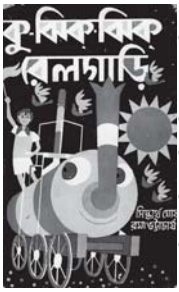

ও.সি গাঙ্গুলি/ কু ঝিক ঝিক রেলগাড়ি

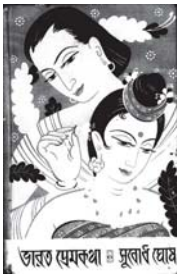

আশু বন্দোপাধ্যায়/ভারত প্রেমকথা

রনেন আয়ান দত্ত/নাবিক

পালেদ চৌধুরী/প্রাণেশ্বর উপাখ্যান

শৈলচক্রবর্তী/স্বপ্নের সন্ধানে মানুষ

পৃথ্বীন্দু পত্রী/বাংলার লোক-সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব

সুবোধ দাশগুপ্ত/ঝড়

পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়/ভূত পত্রীর দেশে

'ঢাকাই জামদানি'। হ্যাঁ, স্ফুলিঙ্গ, মহুয়া, বনবাণী, সে, খাপছাড়া, চার অধ্যায়, দুই বোন বিশেষ সংস্করণগুলি। অবশ্য এখন সব অতীত– কোনও এক সময়ে ছিল। এর পর এসেছে সিগনেট প্রেস। বিশ্বভারতী প্রকাশনার ঠিক দুটি দশক পর। আরম্ভ এক নতুন যুগের– বলতে পারি 'সিগনেট যুগ'। এখানে তার প্রাণপুরুষ দিলীপকুমার গুপ্ত বা ডি. কে.। তাঁর প্রধান সহযোগী অন্নদা মুন্সী, সত্যজিৎ রায়, মাখন দত্ত গুপ্ত, ও. সি. গাঙ্গুলী, সূর্য রায় প্রমুখ দিকপাল ব্যবহারিক শিল্পীরা। সত্যজিৎ রায়, ও.সি. তখনও চলচ্চিত্রশিল্পে আসেননি– সময়টা ছিল তাঁদের প্রস্তুতিপর্ব।

বিশ্বভারতীর মতনই বইয়ের প্রচ্ছদ থেকে আরম্ভ করে তার আকার, প্রকার, ভিতরের অলংকরণ, টাইপ, নির্বাচন, হাফ টাইটেল, টাইটেল এমনকি বিজ্ঞাপনের এক আমূল পরিবর্তন আনলেন– এক নতুন আধুনিকতায়। বিশ্বভারতীকে যদি বলি আধুনিক, সিগনেটকে বলব 'নব্য আধুনিক'।

বিশ্বভারতী প্রকাশনায় ছিল এক ধরনের গোঁড়ামি– ছিল এক ধরনের পৌনঃপুনিকতা। এই বোধ হয় এক ধরনের সংস্কার। কী কী করা যাবে আর কী কী করা যাবে না তার বোধ একটা অলিখিত নিয়ম ছিল। এদিকে সিগনেট-এর ডি.কে. ও তাঁর সহকর্মীরা ছিলেন এর সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে। বিষয়বস্তুকে যে-কোনওভাবে পাঠকের কাছে আগাম বার্তারূপে তাঁদের এই ভাবনা প্রকাশের জন্য তাঁরা কখনও এনেছেন প্রতীকী কোনও মোটিফ, আবার কখনও অক্ষরলিপিতে এবং তা সম্পূর্ণভাবে দৃশ্যকলার নিয়ম মেনে অবশ্যই দৃষ্টিনন্দনরূপে। প্রচ্ছদগুলি মস্তিস্কনির্ভর মননশীল হওয়া সত্ত্বেও এদের দৃশ্যরূপ কখনও পাঠকের কাছে কোনও বোঝা হয়ে ওঠেনি। এ প্রসঙ্গে চ্যাপলিনের চলচ্চিত্র-নির্মাণের কথা মনে করা যেতে পারে। চ্যাপলিন চলচ্চিত্রে হাস্যরসের অন্তরালে তাঁর তির্যকদৃষ্টি সবার বোধগম্য না হলেও ছবি উপভোগ করতে যেমন বাধা সৃষ্টি করে না, অনেকটা সেরকমই।

এখানে প্রশ্ন আসে, কেমন হবে এই প্রচ্ছদশিল্প। আমার মনে হয়, অনেকটা আমন্ত্রণপত্রের মতো। এ যেন এক পাঠককে আহ্বান-স্বাগতম। পাঠকের মনে যেন কোনও বিরক্তি উৎপাদন না করে, বিষয়বস্তু যতই রূঢ় হোক না কেন তার প্রকাশ যেন হয় সুন্দরের মধ্যে। তা সে কোনও ছবি বা প্রতীকী মোটিফ দিয়েও হতে পারে কিংবা অক্ষরশিল্প দিয়েও হতে পারে এক আলংকারিক পটভূমি। এই সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে ক্ষেত্র কিন্তু সীমিত। মাত্র একটি পৃষ্ঠা আয়নার এক টুকরোর মতো যেখানে একজন পেন্টার তাঁর ভাব প্রকাশের জন্য ক্যানভাসের আয়তন বৃদ্ধি করতে পারেন, একজন চলচ্চিত্রকার তো কয়েক হাজার ফুট ব্যয় করেন– মন্তাজের জন্যই তো প্রয়োজন হয় দুয়ের অধিক দৃশ্য। কবি তাঁর হাইকু রচনার জন্য প্রয়োজন তিনটি পঙ্‌ক্তি– গল্পকার তো কখনও কয়েকশো

পৃষ্ঠার প্রয়োজন বোধ করেন– সেক্ষেত্রে একজন প্রচ্ছদশিল্পীর জন্য বরাদ্দ মাত্র একটি পৃষ্ঠা।

স্বাভাবিকভাবে প্রচ্ছদশিল্পীকে নির্বাচন করতে হয় এমন এক দৃশ্যবস্তু যা ওই বইয়ের কয়েকশো পৃষ্ঠাব্যাপী বিস্তৃত পটভূমির নির্যাসকে ওই বরাদ্দ পৃষ্ঠার মধ্যে প্রকাশ করতে পারে।

এই প্রচ্ছদভাবনাকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি : ১) নিছক আবরণ বা আচ্ছাদন। কোনও মোটা কাগজের উপর বই ও লেখকের নাম এবং প্রকাশনাসংক্রান্ত কিছু তথ্য যা প্রকাশনা-শিল্পের প্রারম্ভে আমরা দেখতে পাই। ২) আলংকারিক বা Decorative বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন তাকে সুন্দরভাবে পরিবেশন করা। এখানে সবসময়ে সঙ্গে সম্পর্ক কিছু পাওয়া যাবে তার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। এ প্রসঙ্গে পঞ্চাশের দশকের আশু বন্দ্যোপাধ্যায় পরিকল্পিত 'শ্রেষ্ঠ গল্প' সিরিজের বইগুলি মনে করা যেতে পারে। একই ডিজাইন শুধু রঙের পরিবর্তন ও মধ্যিখানের নির্দিষ্ট সাদা জায়গায় লেখকের নাম পরিবর্তিত হয়ে যায়। এখানে অক্ষরশিল্প ব্যবহার করা যায় কিন্তু তা কোনও অর্থ বহন নাও করতে পারে। প্রসঙ্গত অক্ষরশিল্প একটি উন্নত শিল্পমাধ্যম। একটা কথা আছে অক্ষরলিপিও কথা বলতে পারে। এখানে উদাহরণ হিসেবে অন্নদাশঙ্কর রায়ের দেখা বইটির প্রচ্ছদের কথা বলা যায়। যার প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন লীলা রায়। অপরাজিতা গোপ্পীর আহত পাখীর মত ডানা— ঝাপটায়। প্রচ্ছদ খালেদ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথের দুই বোন, সৈয়দ মুজতবা আলীর শহর ইয়ার– প্রচ্ছদ এঁকেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী– সত্যজিৎ রায়ের আঁকা দ্বন্দ্ব প্রভৃতি। ৩) অনুভবী বা Subjective যা নিয়ে আগেই বলা হয়েছে। আমার কাছে এই ধারাটি প্রচ্ছদশিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ট ধারা। মননশীল অক্ষরশিল্পও এ ধারার মধ্যে আর-একটি দিক। পূর্ণেন্দু পত্রীর কেতকী কুশারি ডাইসনের সজীব পৃথিবী শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সোনার মাছি খুন করেছি, ভবতোষ দত্তর দৃষ্টিকোণ। আশু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরোগ্য নিকেতন। প্রসঙ্গত, এই শিল্পী বহু দিন ধরে বাংলা সাহিত্যের প্রচ্ছদের অন্যতম কারিগর। ইন্ডিয়ান পেন্টিং-এর বিশেষ ধারাটি তাঁর শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য– অবশ্য অধিকাংশই আলংকারিক পর্যায় পরে। খালেদ চৌধুরী বিভিন্ন ধারায় কাজ করেছেন, আলোচিত এই ধারায়ও তাঁর কাজ কম নয়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের রত্নাকর গিরীশচন্দ্র , মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিবারাত্রির কাব্য, সৌরীন সেনের তেতো কফি, সত্যজিৎ রায়ের পরমপুরুষ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ, শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত, জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেন, রূপসী বাংলা। সুকুমার রায়ের খাই খাই, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জলপ্রপাতের ধারে দাঁড়াবো বলে প্রভৃতি অসংখ্য প্রচ্ছদকে আমরা এই ধারার সঙ্গে যুক্ত হতে দেখি। শুধু এঁরাই নন, সুবোধ দাশগুপ্ত, পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়, মণীন্দ্র মিত্র, অজিত

দেবল বন্দ্যোপাধ্যায়/দিন যাপন

অজিত গুপ্ত/ চৌরঙ্গী

বিপুল গুহ/ দু'নম্বর

সমীর সরকার/ প্রথম প্রহর

হরণ মিত্র/চিড়িয়াখানা

দেবব্রত ঘোষ/আগুন পাখি

সুব্রত চৌধুরী/হারানো খাতা

দেবাশীষ দেব/আধখানা ভূত

গুপ্ত, বিপুল গুহ, রঘুনাথ গোস্বামীর নাম একই সঙ্গে উচ্চারিত হবে। ৪) বর্ণনামূলক বা Narative এই ধারাটি সাধারণত গল্প-উপন্যাসেই ব্যবহৃত হয় এবং তা যথেষ্ট জনপ্রিয়। পাঠ্যের কোনও বিশেষ ঘটনা বা বর্ণনাকে চিত্রায়িত করে প্রচ্ছদরচনা অবশ্যই আলংকারিক ধারার সমন্বয়ে সৃষ্ট হয়। আমার মনে হয়, এখানে এতে করে মাঝেমধ্যে গল্পের সাসপেন্সের কিছু ব্যাঘাত ঘটতে পারে। আবার এ কথাও সত্যি, কোনও ঘটনা বা দৃশ্য সবসময়ে সমগ্রকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। এই দৃশ্য বা ঘটনা সমগ্রের খণ্ডাংশমাত্র। সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা সিরিজের অধিকাংশ প্রচ্ছদগুলিকে আমরা এই পর্যায়ে দেখতে পারি।

প্রচ্ছদ শিল্পের এই দীর্ঘ বিবর্তনে মুদ্রণশিল্পে এসেছে অনেক পরিবর্তন। কাঠখোদাই থেকে লেটার প্রেস হয়ে আজকের এই কম্পিউটার গ্রাফিক্স-অফসেটের যুগে পৌঁছে আমরা ভালমন্দ অনেক কিছুরই সম্মুখীন হয়েছি। কাঠখোদাই-এর কথা বাদ দিয়ে লেটার প্রেসের কথা বলি। লেটার প্রেস পদ্ধতি ছিল বেশ পরিশ্রমসাধ্য ও ব্যয়বহুল। আশির দশকের প্রারম্ভে আস্তে আস্তে অফসেট মুদ্রণ শুরু হলেও তা ছিল যথেষ্ট ব্যয়বহুল। সবাই সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারত না। কিন্তু পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে আস্তে আস্তে লেটার প্রেস পদ্ধতি প্রায় নেই বললেই চলে। উল্লেখযোগ্য গত কয়েক দশকে আমাদের দেশের বিখ্যাত ব্যবহারিক শিল্পীরা তাঁদের স্মরণীয় কাজগুলি এই পদ্ধতিতেই করে গেছেন। সত্যজিৎ রায়, খালেদ চৌধুরী, পূর্ণেন্দু পত্রী, অজিত গুপ্ত, সমীর সরকার, সুধীর মৈত্র প্রভৃতি সবাই। শেষ কয়েক বছর সমীর সরকার, পূর্ণেন্দু পত্রী সামান্য সুযোগ পেয়েছিলেন, আর না নিয়েও খুব যে একটা অসুবিধা হত তাও নয়।

সব কিছুরই ভালমন্দ আছে। নতুন পদ্ধতিতে তা যথেষ্টভাবে লক্ষিত হয়। এখানে রঙের জন্য ভাবতে হয়, যত ইচ্ছে রং ব্যবহার করা যায়, এখান ওখান থেকে নিয়ে একটা কিছু ঘটিয়ে ফেলা যায়, তার কোনও মানে থাকুক, বা না থাকুক ঝকঝকে চকচকে হলেও চলে। প্রচ্ছদনামের জন্য DTP টাইপ আছে ক্যালিগ্রাফি প্রায়ই বিদায় নিয়েছে। তবুও তার মধ্যে আমরা পাই হিরণ মিত্র, দেবব্রত ঘোষ, সুব্রত চৌধুরী, দেবাশীষ দেব, কৃষ্ণেন্দু চাকী প্রমুখ শিল্পীদের মতন প্রচ্ছদশিল্পীদের দেখা পাই আর এঁরাই বোধহয় বিগতধারার শেষ প্রতিনিধি। এঁরা কম্পিউটার জানেন। তাঁদের সহযোগী বিশ্বস্ত বন্ধু সহকর্মী ওঁরা আদেশপালন করতে পারেন আর-কিছু নয়। তার জন্য হয়তো কম্পিউটার উদ্‌গ্রীব। কিন্তু চালনা তো একজনকে করতেই হবে। চালক ছাড়া ওঁরা কিন্তু স্থবির। এখনকার নতুন প্রজন্ম আস্তে আস্তে চালক হয়ে উঠবে অচিরেই এই আশা করি।

প্রচ্ছদের মন, মনের প্রচ্ছদ

হিরণ মিত্র

হিরণ মিত্র/অন্বেষণ

বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদকে অনেকগুলো ভাগে ভাগ করে নিলে, বিষয়, ভাষা, দৃশ্য-ভাষাকে যথাযথ ভাবনায় স্পর্শ করা যায় হয়তো। কবিতা, গল্প, উপন্যাস– গদ্য, প্রবন্ধ, গবেষণামূলক লেখা, ইতিহাস এইভাবে নানা তার প্রয়োগ। আমি প্রধানত কবিতার প্রচ্ছদ নিয়েই বলতে চাই।

—ছবি ও কবিতার একান্ত জগৎ সমান্তরাল চলে। ব্যবহারের চতুষ্পার্শ্ব থাকে আপাত নীরবে। কিন্তু সমস্ত জীবনীশক্তি সঞ্চিত রেখে এরা আমাদের ভিতর থেকে চালায় বাইরের বিশ্বচরাচরে এর উপস্থিতি প্রায় টের পাওয়া যায় না। প্রদর্শনীকক্ষে, বইয়ের পাতায়, পাণ্ডুলিপির ছেঁড়া অংশে, ছবিতে, ভাস্কর্যে এদের দেখা মেলে না। এরা সৃষ্টির অদ্ভূত এক পর্বে কবিতার আশ্চর্য লাইনের মতো নীরবে থাকে।

উৎপলকুমার বসুর লেখা থেকে–

'অবাক স্বর তুমি, ভাষা পরিত্যাগ করেছে তোমাকে।'

হিরণ মিত্র/অহঙ্কারের সিন্দুক

অদ্ভূত রেখাগুলো কাগজে আঁচড় কেটে যায়, কখনও মসৃণ কখনও কর্কশ। তাতে তাতের দেহে কোনও হেলদোল নেই। তারা টানটান কাগজ আঁকড়ে থাকার মতো জনপদ ছাড়িয়ে নিভৃতে থেকে যেতেই থাকে। মাঝে মাঝে শুকনো সর্‌সর্‌ আওয়াজ তোলে। আবার থেমে যায়। চারিদিক নিস্তব্ধ। রেখাগুলো শুধু তাকিয়ে। দ্রুত টান মনকে সামান্য বিচলিত করে, সকালের সংবাদে হেডলাইনের মতো।

কবিতা পাঠকের কাছে, ধ্বনি, দৃশ্য, অনুভব, কখনও-কখনও স্পর্শ ও গন্ধও প্রতিভাত হয়। সেই অর্থে কবিতাপাঠ এক কঠিন ক্রিয়া। পাঠপ্রতিক্রিয়াও বেশ জটিল। অঙ্কনশিল্পীরা, যারা দৃশ্যের কারবারী, তাদের যে মনোজগৎ, সেখানে এই প্রতিক্রিয়া তেমনভাবে প্রবেশ করে না। করে না, কারণ দৃশ্যের উপস্থিতি, তার প্রাধান্য, এমন এক সৌন্দর্য বা অ-সৌন্দর্য, আকারের, রঙের পারস্পরিক ছন্দ, শেষপর্যন্ত, দৃশ্যটি, দৃশ্যনন্দন হয়ে ওঠার দাবি, শিল্পীকে এতটাই আচ্ছন্ন করে রাখে, দীর্ঘ পাঠ-অভ্যাস ছাড়া, তা অতি সরলীকরণের ফাঁদে পড়ে যায়। হয়তো এই কথাগুলো একপেশে শোনাচ্ছে। খুবই দক্ষ শিল্পী, কেন দক্ষ, তাকে ব্যাখ্যা করলেই বোঝা যাবে। মস্তিস্ক ও আবেগ, শরীর ও মনের যথাযথ সামঞ্জস্য তাকে এমন কাজে সফলতা দেয়। এই সফলতা সম্পূর্ণই দৃশ্য-সফলতা। বিষয়-সফলতা নয়। বিষয় অর্থাৎ কবি ও কবিতার, যার মুখাবয়ব রচিত হচ্ছে, প্রচ্ছদে, তাকে প্রায় অবজ্ঞা বা পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়াই রীতি

হিরণ মিত্র/বিনোদনের গল্প

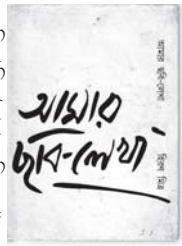

হিরণ মিত্র/আমার ছবি-লেখা

হিরণ মিত্র/ধানখেত থেকে

হিরণ মিত্র/দুর্লভ শিখর দেশ

হিরণ মিত্র/ভ্রমণ কাহিনী সমগ্র

হয়ে উঠেছে বাংলা কবিতার বইয়ের প্রচ্ছদের কাহিনিতে। কেন এমন হল তারও কারণ আমরা অনুমান করতে পারি। কবিতার পাঠক নয়, অথচ, শিল্পী হিসেবে খ্যাত, এমন লোকেরাই ঘটনাচক্রে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। কীভাবে বোঝা যাচ্ছে, কবিতার পাঠক নন, দুটো কারণ, এক– কবিতার যে বিস্তীর্ণ জলা বা শুষ্ক জমি, তাতে তাঁকে হাঁটতে দেখছি না আমরা, নামকরণের সীমিত গণ্ডিতে শিল্পী বেশ স্বস্তি পাচ্ছেন, তাকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন, এবং কবির নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী ভাষাপ্রকাশ সে সম্বন্ধে শিল্পী নিজেকে সযত্নে রক্ষা করে বিভ্রান্তি এড়াচ্ছেন। অলংকরণ-শিল্পীরা এদেশে, কোনও ধরণের বিভ্রান্তি পছন্দ করেন না। আমি ব্যক্তিগতভাবে এমন বৃত্তিতে দীর্ঘদিন থেকে বুঝেছি, সমস্ত অলংকরণ সমাধান হতে হবে– অমোঘ, নিশ্চিত এবং চাঁদমারিতে কেন্দ্রবিন্দু ছোঁয়ার আপ্রাণ চেষ্টার মতো। এইখানেই বিপত্তি। কোনও বিশেষ ঘরানার বা বিশেষ ভঙ্গির শিল্প-অভ্যাসকে আমি সমালোচনা করছি না, কিন্তু কবিতা লেখা, কবিতার চর্চা, কবিতার ভাষা প্রয়োগ এই ধরনের অলংকরণ- সমাধানকে অনুমোদন দেয় না, না দেওয়ারই কথা। সাধারণভাবে কবিতার পাঠককে আমি তাই, তার কৃত্রিম মুখাবয়ব বা প্রচ্ছদকে এড়িয়ে যেতেই দেখেছি। এমনকি কোনও প্রশ্ন তুলতেও দেখিনি। সে, এক মনের অবস্থায় কবিতা পড়ছে, আর অন্য এক মনে প্রচ্ছদকে দেখছে। এই বৈপরীত্য নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে, মতের মধ্যে বিরোধ আসতে পারে, তবুও এই দীর্ঘ প্রচ্ছদকাহিনিকে যদি খুবই নিবিড়ভাবে লক্ষ করি, বুঝতে পারব, এ কত সহজ, কত সরলীকরণের, সামান্য আভাসের বৃত্তে জড়িয়ে পড়েছে। যেমন এক প্রচলিত ধারণা এই চর্চায় আছে, কবিতা এক অসম্ভব সুন্দর, প্রায় ফুল, লতাপাতা, তার অনুপাত ও সৌন্দর্য নিয়ে সবসময়েই বিহার করে। তাই প্রতিটা কবিতা-প্রচ্ছদ অলংকৃত হয় নানা অলংকারে। এটাই তার ভবিতব্য, কবিতাসমগ্র, নির্বাচিত কবিতা, শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির প্রচ্ছদ লক্ষ করলে এ কথার প্রমাণ মিলবে। প্রকাশক ও শিল্পী এ ব্যাপারে একশো শতাংশ নিশ্চিত। তাদের ক্রিয়া প্রশ্নাতীত। কার কবিতা, তার শরীরের ঘ্রাণ কেমন, রূপ কেমন এটা গৌণ হয়ে যায়। হয়তো এর একটা বাণিজ্যিক দিকও আছে। দ্বিতীয়ত, শিল্পীর প্রতিষ্ঠা। বহু প্রখ্যাত শিল্পী অনুরোধে এমন কাজে ব্রতী হন। তার খ্যাতিই প্রাধান্য পায়, কর্মটি গৌণ; এবং কবিতার প্রচ্ছদ রচনার আগে, কবি ও তার কবিতা শিল্পীর জ্ঞানের বাইরে থাকাই রেওয়াজ। আমি কখনও কোনও শিল্পীকে এমন প্রশ্ন করতে শুনিনি বা দেখিনি। কবিতাগুলির ভাষা কী? কেমন তার আঙ্গিক। নাম ও তার দৃশ্য-উন্মোচনই গুরুত্ব পেয়ে এসেছে।

কবিরা বিভ্রান্তি ছড়ায়। অনেক সংকেত গোপন করে। ভাষার আড়ালে, ধ্বনির আড়ালে শব্দের বেড়াজাল তৈরি করে, এক ধরনের আত্মরক্ষা করার ব্যবস্থা করে, সেই যুদ্ধক্ষেত্রে। এটা তো মানতেই হয়, কবিতার পটভূমি সে প্রেম বা প্রেমহীন, জমি একটি দ্বৈরথের ভূমি। কবিতা কবিকে হত্যা করতে সদা-উন্মুখ। এমন এক ভয়ানক প্রস্তাবে, শিল্পীরা স্বভাবতই চমকে উঠবেন। তিনি তো শান্ত, সমাহত, নিরুপ্রদবভাবেই কবিতার কথা শুনে এসেছেন। সেইজন্যই তো কবিতা, ফুলের মতো, সদ্যযৌবনা নারীর মতো, অর্ধস্ফুটিত বাসনা নিয়ে, উন্মুখতা নিয়ে, অন্ধকারে চোখ তুলে তাকানোর ভঙ্গিতেই নিবিষ্ট থাকল।

প্রশ্ন করতে চাইল কিন্তু ভুলে গেল। ক্রোধ, অস্বস্তি, বিরক্তি, না-ভাল লাগা, রয়ে গেল কবিতার শুকনো অক্ষরের মধ্যে আটকে। তাকে পাশ কাটিয়ে রচিত হল আর-এক বিভ্রান্তি। ভাষাকে রূপান্তরিত করা সহজ হল শুধুমাত্র এই ভাষার আক্ষরিক অর্থকে প্রাধান্য দিয়ে। এই বিষয়টাই আমার ভাবনার বিষয় করতে চাইছি।

প্রথমেই যে দুটি পরিচ্ছেদ আমি রেখেছি, আমারই পুরনো লেখা, 'কবিতার আশ্চর্য শরীর' নামে ছবি ও কবিতার আত্মসম্পর্ক, আমার বুঝদারিতে কেমন তাকে ব্যাখ্যা করার জন্য।

আশা করি ইতিমধ্যেই আমি আমার ভাবনার অভিমুখ পাঠককে বোঝাতে পেরেছি। নানাভাবে ক্ষতবিক্ষত হতে হতে, বিভ্রান্ত হতে হতে, ভাষা থেকে দৃশ্যভাষা আবিষ্কারের জটিল ও ব্যতিক্রমী ভাবনার যে ছবি ভেসে উঠবে তাকে ভাসিয়ে তোলার, মেনে নেওয়ার, দীর্ঘ পরিশ্রমী চলন, শিল্পীরা সাধারণত এড়িয়ে চলেন। এটাই রীতি। স্বাভাবিক রীতি। অক্ষরশিল্পের, কারুকার্যের ক্রিয়াই তাই প্রাধান্য পায়। দৃশ্য-সরল রাস্তা খোঁজে।

আরও একটি বিষয় একটু ছুঁয়ে যাওয়া উচিত– লিখিত ভাষা, এবং সেই ভাষা থেকে উদ্ভূত ছবি কি এক? ভাষা যা বলছে, শেষপর্যন্ত সেই কথাই সে বলছে? নানা তার ভান। পাখি, ডানা, তাতে লেগে-থাকা রোদ, শেষপর্যন্ত আকাশে পাখিহীন এক উড়ন্ত অনুভবকেও আশ্রয় করতে পারে। এমন অজস্র সম্ভাবনা বিমূর্ত হয়ে কবিতার শরীরের ছোট ছোট সংকেত হয়ে, গাছের কোটরে বা ডালে, নানা খড়কুটোর বাসার মতো, লেপটে লেপটে থাকে, ঝড়ের দাপটে সেই বাসাটিও হয়তো উধাও হয়ে গেল, তাই কবিতা একটা যাপন। দীর্ঘ, বিলম্বিত যাপন। আমাদের অলংকার জীবনে এই যাপন অনুপস্থিত থাকে। তাকে আমরা অনুমোদন দিতে পারি না। তাকে আহ্বান করে, নিজের

হিরণ মিত্র/ গল্প একাদশ

হিরণ মিত্র/ গরমাবির বাপু

হিরণ মিত্র/ হেগেল: জীবন ও দর্শন

হিরণ মিত্র/ হাইকু

হিরণ মিত্র/ইরাকি কবিতার ছায়ায়

উঠোনে ঠাঁই দিতেও পারি না। এর জন্য যে অনিশ্চিত, হয়তো কিছুটা শৃঙ্খলাহীন, বেখাপ্পা আবেগ লাগে, তাকে প্রশ্রয় দেওয়া একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর পক্ষে সম্ভব হয় না। কারণ তার প্রতিষ্ঠা তাকে কিছু বিধিনিষেধে আবদ্ধ করে। প্রথমত, তার স্টাইল, তার দম্ভ, তার দক্ষতা, তার বিশেষ কল্পনাশক্তি, সবই তার শিল্পের বিরুদ্ধে তারই অজান্তে ক্রিয়া করে যায়। তাকে সৃষ্টিতে অন্ধ হতেই হয়। এই অন্ধত্ব দৈহিক অন্ধত্ব নয়। ভাবনা, বিষয়, পাঠ, অন্ধত্ব। তিনি কোনও পরিস্থিতিতেই বিভ্রান্ত হতে চান না।

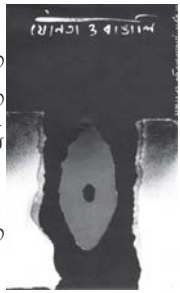

হিরণ মিত্র/যৌনতা ও বাঙালি

এর পর মূল বিষয়ে ঢুকে পড়া যাক– কিছু দৃশ্য-উদাহরণ ও মূল কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে, সামান্য আলোচনা করলে কিছুটা ধারণা করা যাবে, কাকে আমি কবিতা যাপন বলছি, কাকে পাঠ বলছি, কাকে অলংকরণের শৃঙ্খলা বলছি। কোনও শিল্পীকে অসম্মান বা তার শিল্পপ্রতিভাকে প্রশ্নের সামনে ফেলে দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। দুটি বিষয় আমি জরুরি মনে করেছি, এক শিল্পীদের কবিতাচর্চার চেহারা, তার মধ্য দিয়ে কবিতাপ্রচ্ছদের ধারা ও দৃশ্যকাহিনি কেমন, আর শেষপর্যন্ত এই সম্বন্ধে কোন দর্শন প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তাকে বুঝতে যাওয়া। তাতে কোনও অপরাধ আছে বলে আমি মনে করছি না, কারণ এই চর্চা, আমাকে অন্য প্রজন্মকে একটা অভিমুখ দিতে পারে। ভুল-ঠিকের বাইরে।

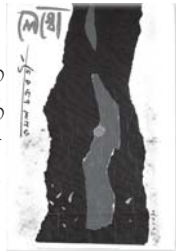

হিরণ মিত্র/লেখা

দ্বিতীয় উদাহরণ, বনলতা সেন। এটির প্রকাশক সিগনেট প্রেস। কবি জীবনানন্দ দাশ। শিল্পী সত্যজিৎ রায়। কথিত আছে এই প্রচ্ছদটি কবির অনুমোদন পায়নি। সেটা অন্য প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রচিত্র অনুসরণে, একটি নারীমুখ, সূদাতিসূদ রেখার জালে বুনে তোলা হয়েছে। সম্পূর্ণ প্রচ্ছদটি খুবই যত্ন সহকারে রচিত। মুখের চারিদিকে খোলা চুলের বিস্তার। দক্ষ রেখার টান, অনুপাত, জলটানা সমান্তরাল রেখার আঁচড় যেন বালিতে জলের ঢেউ চলে যাওয়ার পর স্পর্শ ও অলংকার ফেলে গেছে। আপাতভাবে প্রশ্নাতীত শিল্পকর্ম। আমরা যদি মূল পাঠে চলে যাই– অংশত–

হিরণ মিত্র/মহাকর্ষের কথা

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতিদূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

আশা করি, ভাবতে ভাল লাগছে, শ্রীরায় এই কবিতাটি পড়েছিলেন। তা না হলে, এই মুখশ্রী, অমন শ্রাবস্তীর কারুকার্য সদৃশ চুল, আড়চোখে

তাকানো, এসব কিছুই ঘটত না হয়তো। তবুও প্রশ্ন ওঠে, বনলতা একটা ধারণামাত্র। সে প্রশ্নও করে না, উত্তরও খোঁজে না। কারণ—

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;

শিশিরের শব্দ, রৌদ্রের গন্ধ, নিভে যাওয়া সব রং, জোনাকির রঙে ঝিলমিল যার পরিণতি—

সব পাখি ঘরে আসে— সব নদী— ফুরায় এ-জীবনের সব লেন দেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

কবির অমোঘ বাণী, অন্ধকার। সেখানে চিত্র নেই, আলো নেই। রং নেই, একটা মুখোমুখি থাকার আকুতিমাত্র, কিন্তু সেখানেও কবি নিশ্চিত। কিন্তু তীব্র আগ্রহ আছে। অন্ধকারে পার্থিব দৃষ্টি যায় না, কিন্তু কবিতার আকুতি ছুটে যায়। ধৃষ্ঠতা মার্জনা করবেন পাঠক, আমি এক তমসাকে দেখতে পাচ্ছি, চোখ সিঁধোয় না এমন এক গভীর তমসা। হয়তো তমসাকে অতিক্রম করার আলো অর্থে কাল্পনিক, কবি-রচিত কোনও এক বনলতা সেন। এ কবিতাকে হাজারো রকমের পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় নিয়ে যাওয়া যায়। কৈশোরে, যৌবনে, বার্ধক্যে।

বেলা এগারোটার রোদ— উৎপলকুমার বসু, সপ্তর্ষিপ্রকাশন, শিল্পী হিরণ মিত্র। প্রচ্ছদটি কালো, আকাশসদৃশ পটভূমিতে, একটি গোল আকার, সূর্য হতে পারে, চাঁদও, আবার কাঁটাহীন একটি সময়-ঘড়িও। সামান্য আভাস আছে তার। কেন এমন সমারোহ।

কবি লিখছেন—

গ্রীষ্মকালের শান্তি।
সন্ধ্যার লোকলৌকিকতার দিকে
এগিয়ে চলেছি।
জেগেছি গভীর রাত। রৌদ্রভেদী চাঁদের উৎসবে
লোকসমাগম ছিল ক্ষীণ।...
...
স্বতন্ত্র এ-বাহুর চলা, হাত দিয়ে হাঁটি।
গ্রীষ্ম-দুপুরের শান্তি— সন্ধ্যার লোকলৌকিকতা।
গভীর সান্নিধ্য থেকে জেগেছে সংশয়।
ও কেমন ভাবুক বলো তো
ও হয়তো আসলে মানুষ নয়— পশুপাখি, গাছপালা?

দুটি কবিতা, 'বেলা এগারোটার রোদ' ও 'বাবা। ভয় করছে' তার কয়েক পঙ্‌ক্তি। কবির নিজস্ব সংশয়, রৌদ্রভেদী চাঁদ, এ কেমন বলার ঢং?

হিরণ মিত্র/মায়াবন্দরের রূপকথা

হিরণ মিত্র/নিবিড়ের সজলতা

হিরণ মিত্র/নিজের কথা

হিরণ মিত্র/পথে প্রবাসে

প্রচ্ছদ/চিত্র : বাসুদেব গুহ

প্রচ্ছদ/চিত্র : সত্যজিৎ রায়

প্রচ্ছদ/চিত্র : সত্যজিৎ রায়-অনুপ্রেরণা

প্রচ্ছদ/চিত্র : সত্যজিৎ রায়

আমি তাই বিভ্রান্তিকেই গুরুত্ব দিয়েছি। রাতের কালো আকাশ, চাঁদের রং লাল হয়, যখন সমুদ্রের পিঠ থেকে তাকে জাগতে দেখি। ভ্রম হয় সূর্য বলে। সময় একটি বড় সম্পদ। কিন্তু সময় উচ্চকিত নয়। নির্দিষ্ট নয়। ভ্রম হয় লোকলৌকিকতার দিকে ক্রমশই এগিয়ে যায়। কবির অনুমোদন ছিল এই দেখাটিতে।

অক্ষয় বটের দেশ পার হই—কালীকৃষ্ণ গুহ। প্রকাশক বাগর্থ। শিল্পী সোমনাথ ঘোষ। দু-হাত বাহুর মতো মেলে দেওয়া, একটা গাছের আভাস, হয়তো বটগাছ। অক্ষর কারুকার্যে নামকরণ। উপর থেকে নেমে এসেছে নীচে। হালকা ধূসর, হালকা খয়েরি, কালো। তিনরঙা। আপাতভাবে কোনও পীড়া দেয় না চোখে। কিন্তু ভাবনায়? পিতৃলোক কবিতায় লিখছেন—

অনাথপিণ্ডক, আমি, অবিশ্বাসী, ভ্রমণপিপাসা নিয়ে
পথে পথে সারাদিন ঘুরি—
প্রপিতামহের স্মৃতি ব্যঞ্জনাবিহীন
পিতামহ অনুচ্চারিত
পিতা নিসর্গপ্রতীক
পিতৃলোক উচ্চারিত হয় এইভাবে
ঘুরি পিণ্ড হাতে
ফল্গুতীর থেকে জীপ—ধুলো কাক অড়হরখেত
অক্ষয়বটের দেশ পার হই
দেখি, ব্রাহ্মণের খিদে ধীরে ধীরে গ্রাস করে স্তব্ধ পিতৃলোক—
সেখানে দাঁড়াই, একা, মর্মাহত, অনুভূতিহীন
প্রেতশিলা থেকে শান্তি নামে দিনশেষে...

আপাত-অসম্পূর্ণ একটি কবিতা, বইয়ের শেষ কবিতা, প্রজন্মের পর প্রজন্ম, একটি যাত্রা, প্রচ্ছদে সেই যাত্রার কোনও আভাস নেই। একটা জলের ধারার আভাস অবশ্য আছে। কোনও কাজই আমার আলোচনায়, ভাল কী নন্দ এই প্রশ্ন তুলছে না। উপযুক্ত কী অনুপযুক্ত সে-কথাও বলছে না। পাঠককে একটি অভিমুখের কথাই শুধু বলছে। চিত্রের, ভাবের, ভাবনার গভীরতা ছুঁয়ে, সে শেষপর্যন্ত, অতিসরলীকরণের আক্ষরিক দৃশ্য-অনুবাদে আটকে পড়ছে কি না সেই কাহিনির ছানবিন চলছে। এই বইয়ের প্রথম কবিতা 'বিষাদ জন্ম নিলো' সমস্ত কাব্যগ্রন্থের মূলসুর যেন বেঁধে রেখেছে। যেখানে শুনতে পাচ্ছি, অংশত উল্লেখ করছি—

...কলাভবনের মাঠে
রামকিঙ্কর বেইজ
তাঁর নির্বাণ থেকে
বিষাদ জন্ম নিলো

পৌষালি পার হয়ে
একাকী শরীর জুড়ে
বিষাদ জন্ম নিলো
চরাচর জাগে একা

উনিশশো সাতানব্বই সালের, আমার বিশালকায় সাদাকালো ক্যানভাসে এমন বিষাদ জন্ম নিয়েছিল। এ কথা কালীকৃষ্ণ বিশ্বাস না করলেও, আজও সেই ক্যানভাসগুলো চিলেকোঠায় বিষাদে শুয়ে আছে।

চিত্রের সাথে কবিতার সম্পর্ক এমনই। সে সেখানে একা। চরাচরে জেগে থাকে। কেউ তাকে দেখে, কেউ তাকে দেখে না। কেউ তাকে পড়ে, কেউ তাকে পড়ে না। তবুও তাদের সম্পর্কে চিড় খায় না। ভাষা থেকে দৃশ্যের জন্ম হয়, দৃশ্য থেকে ভাষার। অনেক মতোবিরোধ আছে, বিতর্ক আছে, কিন্তু আমার আগ্রহ ও কৌতুহল এগিয়েই চলে। একেবারে বিপরীতে একটি বই–

কলোনির কবিতা। রাহুল পুরকায়স্থ। প্রকাশক অনুষ্টুপ। শিল্পী হিরণ মিত্র। এই প্রচ্ছদটি যখন আমাকে আঁকতে বলা হয়, তখন কবিতাগুলি পড়তে পড়তে, যেগুলি নামহীন, শুধু ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে তাদের চিহ্নিত করা, যেখানে আবার, বিষাদ, যৌনতা, মৃত্যু, কাল এসবের সমাগম। চোখ আটকে গেল কয়েকটি ছত্রে–

...এখন দখিন খোলা
হাওয়া বহে
দোলা দেয় স্মৃতির আরক
শহর বদল হয় দ্রুত মফস্‌সলে
কলোনিরা জেগে ওঠে
চরিতেরা জাগে
(ডাক্তার, বিবর্ণ মুখ, তীব্র ফলিডল)
প্রথম প্রেমের মরা, প্রথমে মৃতের
নেশায় জেগেছে আজ...

অথবা

...একদা ভেবেছি বাস্তু, বিষভাণ্ড, নেশাও অন্তিম
একদা ভেবেছি দ্বেষ, দেশহারাদের দুই চোখে
ভেবেছি বায়স বসে, ডমরু গর্জায়
কাঁটাতার রামধনু সমার্থক প্রায়
আমার নিজের স্নায়ুসন্তরণ ভাগ হয়ে যায়

একটা বাতিল অস্তিত্ব। যেন কলোনির দেয়ালগুলো অস্থায়ী। বাস্তুভূমি থেকে উৎপাটিত একটা অস্তিত্ব। মুড়ে দিলাম করোগেটেড খয়েরি বোর্ডে প্রচ্ছদটিকে। যেন টিনের বেড়া। আব্রু ঢাকা, তার আড়ালে কবির মৃত

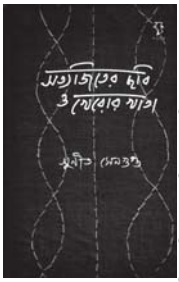

হিরণ মিত্র/সত্যজিতের ছবি ও খেয়োর কথা

হিরণ মিত্র/স্মৃতিতে সেকাল

হিরণ মিত্র/কমল কুমার সৃষ্টি বৈচিত্র্যের খোঁজে

হিরণ মিত্র/স্বাধীন মানচিত্রের কবিতা

তরুণ শিল্পী/তথ্যপ্রযুক্তির বিশ্বে পল্লী ভুবন

তরুণ শিল্পী/তিন পুরুষ

তরুণ শিল্পী/ও তরঙ্গ লায়ও

শোক, যৌনতা, অস্তিত্বের সংকট। 'বিবর্ণ মুখ, তীব্র ফলিডল'। এইভাবেই চলে আমার পাঠ ও তার প্রতিক্রিয়া।

শেষ একটি প্রচ্ছদ দিয়ে এই কাহিনির ইতি টানব।

ভাত নেই, পাথর রয়েছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক দে'জ পাবলিশিং। শিল্পী গৌতম রায়। অতিসরলীকরণের বিশেষ উদাহরণ। প্রচ্ছদে ভাতও আছে পাথরও আছে। খুবই স্বাভাবিক। পাঠক যখন পড়ে বা দেখে, তখন সে আক্ষরিক অর্থে, দুটি অনুষঙ্গ পেলেই সন্তুষ্ট। আঁকলেন খুবই যত্ন নিয়ে, পটভূমি বানালেন, প্রচ্ছদটিকে সামনে ও পিছনে মুড়ে দিলেন। খয়েরি রঙা, বিভিন্ন আকারের পাথর। এর পর এল 'ভাত' এবং তার না থাকা। চিত্রে না থাকা খুবই বিপজ্জনক প্রস্তাব। কোথাও নেই বোঝাতে– আছে বলতে হয়। এখানে কোনও চেয়ার নেই, এই কথাটি একটি সাদা কাগজের তলায় লিখে দিলে তবেই জানা গেল, সত্যিই এখানে কোনও চেয়ার নেই। কিন্তু 'চেয়ার' একটি বস্তু , তার অবর্তমান বোঝাতে দৃশ্য নয় ভাষার আশ্রয় নিতে হল। না-দৃশ্যকে আঁকা যায় না। বলা যায়, লেখা যায়। শিল্পী তাই ভাত নেই, ভাত নেই বলে কালো অক্ষরে আর্তনাদ করে যাওয়াটাই শ্রেয় মনে করলেন।

কিন্তু কবিতায় কী ধরা পড়ল? অংশত উল্লেখ করছি—

...সমস্যার সমাধান পায় ভূয়োদর্শী রাজবাড়ি—
অত্যন্ত সহজে, শুধু মানুষ পাথর নয় ব'লে
পরিত্রাণ পেয়ে যায়। অথচ পাথরে যদি মারো,
ঘা দাও, অমনি বগা ফোঁস করে, ঐতিহ্যমণ্ডিত
দেশের পাথর যদি ছেদ্‌রে যায়, বিদেশ কী কবে।
ছাত নেই, ভাত নেই—কোন্ কাম পাথরে, মচ্ছবে—
তোমাদের?

(সংক্ষেপিত)

এক এবং অদ্বিতীয়

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ডি.কে. অর্থাৎ দিলীপকুমার গুপ্ত—যিনি ছিলেন সিগনেট প্রেসের কর্ণধার। ঠিক এইভাবে নিবন্ধটির সূচনা করা কতদূর সংগত হল, সে নিয়ে আমার নিজেরই বেশ খটকা আছে। তাঁর তো আরও অনেক পরিচয় আছে। এক সময়ে কাজ করেছেন ডি.জে. কেমার-এ, বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানে। পরে আবার বাটা কোম্পানির সমস্ত প্রচার পরিকল্পনার পুরোধা ছিলেন তিনিই। আর ওই বাটা কোম্পানিতে তাঁর যাওয়া নিয়েও একটা চমকপ্রদ গল্প আছে। টমাস বাটার এই জুতো নির্মাণের জন্যে যখন বাটানগর-এর প্রতিষ্ঠা হয়, তখন জহরলাল নেহরুর সেখানে গিয়ে শুভ সূচনা করার কথা ছিল। বাটা কোম্পানির কেষ্টবিষ্টুরা ভাবছিলেন তাঁদের তরফ থেকে কেমন করে নেহরুকে আপ্যায়ন করা হবে। তাঁকে যদি সোনার তৈরি একটা জুতো দেওয়া হয়, যার মধ্যে হিরে-মণি-মুক্তো বসানো থাকবে, তাহলে কেমন হবে? কেউ কেউ আরও মহামূল্যবান উপহারের কথা বলছিলেন, সবই অবশ্য ওই জুতোকে ঘিরেই। খানিকক্ষণ শুনে-টুনে ডি.কে. বললেন তিনি সবিনয়ে একটা কথা জানাতে চান। আমাদের দেশের যে সব প্রথার প্রচলন বা ঐতিহ্য আছে, সেখানে কাউকে জুতো দেওয়া তাঁকে বেহদ্দ অপমান করারই শামিল—তা সে যতই মহামূল্যবান হোক না কেন। কাজেই এই প্রস্তাব আদপেই ভারতীয় ঐতিহ্যকে সম্মান জানায়নি। তাহলে তাঁকে কী দিয়ে আপ্যায়ন করা হবে—কেষ্টবিষ্টুদের জিজ্ঞাসা। 'আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না? অজন্তা গুহার মধ্যে দেওয়ালের গায়ে খোদাই করা এক ছবি আছে। যেখানে এক সুন্দরী তরুণী ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকিয়ে পা থেকে একটা কাঁটা তুলছে। তারই কোনও সযত্নে রচিত (এবং সযত্নে খচিতও) একটি প্রতিলিপি তৈরি করে দেওয়া যায় না? লোকে জুতো কেন পরে। এটা তো তারই চমৎকার একটা যুক্তি খাড়া করা যাবে।' বাঃ! বেশ তো! শেষ পর্যন্ত ওই প্রস্তাবই গৃহীত হল। ডি.কে.-র উপর ভার পড়ল শিল্পী জোগাড় করে সেই পট খোদাই করে দেওয়ার। আর নেহরু তো বাটানগরের উদ্‌বোধন করতে এসে এই উপহার পেয়ে শুধু চমৎকৃতই হননি, একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। আর তার পরই ডি. জে. কেমার থেকে ডি.কে. সরাসরি বাটা কোম্পানিতে তার প্রচার বিভাগের দায়িত্ব পেয়ে গেলেন।

এই কাহিনিটা দিয়েই ডি.কে.-র সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা নিবেদনের সূচনা করাই সমীচীন মনে হল কারণ ডি.কে.-র সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ওই

সত্যজিৎ রায়/আম আঁটির ভেঁপু

সত্যজিৎ রায়/ডেজাল

সত্যজিৎ রায়/ছোট্ট রামায়ণ

সত্যজিৎ রায়/ক্ষীরের পুতুল

বাটা কোম্পানির প্রচার দফতরে ছোটখাটো কিছু কাজ নিয়েই। তার আগে যে ডি.কে.-র সঙ্গে আমার কখনও দেখা হয়নি, এমন অবশ্য নয়। কলেজ স্ট্রিটে সংস্কৃত কলেজের উলটো দিকে সিগনেট বুকশপ-এ আমি প্রায়ই যেতুম, যখন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে বি.এ. পড়তুম। আর দেশপ্রিয় পার্কের উলটো দিকে সুতৃপ্তি রেস্তোরাঁর পাশে সিগনেট প্রেসের যে ছোট্ট বুকশপটি ছিল, সেখানেও যাওয়া হত বৈকি! সুতৃপ্তি তখন ছিল শিল্পী সাহিত্যিকদের আড্ডা দেওয়ার জায়গা। ঠিক যেমন ছিল কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউস। তফাতছিল একটাই, সুতৃপ্তির আড্ডা জমত রোববার সকালেই সাধারণত। কিন্তু কফি হাউসের আড্ডা জমত বরং রোববার ছাড়া অন্য সবদিনেই। যখন স্কুল কলেজ খোলা থাকত। তবে দুটি জায়গাতেই সিগনেট বুকশপ খোলবার ইচ্ছেটা হয়তো বইয়ের কারা সমাদর করবে, তাদের কথা ভেবেই ঠিক করা হয়েছিল। দেশপ্রিয় পার্কের উলটো দিকে, কাছেই, সত্যেন দত্ত রোডে থাকতেন নরেশ গুহ—কবি এবং আমার শিক্ষক, এবং সিগনেট প্রেস-এর 'টুকরো কথা'র রচয়িতা। আর মাসের পর মাস টুকরো কথা বেরুত, কখনও কোনও কোনও পত্রিকায় পাতা জুড়েও ওই 'টুকরো কথা' প্রকাশ করা হত। পরিকল্পনা ছিল ডি.কে.-র নিজেরই। কিন্তু সেটা লিখতেন নরেশ গুহই। আর 'টুকরো কথা'-য় শুধু সিগনেটের বইয়ের খবরই থাকত না। থাকত অন্যান্য প্রকাশকের ছাপা ভাল ভাল বইয়ের কথাও। আর অন্য অনেক প্রকাশকই তা নিয়ে হাসাহাসি করত— গাঁটের পয়সা খরচ করে কেউ অন্যান্যদের বইয়েরও বিজ্ঞাপন দেয়, নেহাত যদি উজবুক না হয়? কিন্তু ডি.কে. চেয়েছিলেন ভাল বাংলা বইয়ের সমাদর হোক— তা সে যেই প্রকাশ করুক না কেন।

কিন্তু আমরা বোধ হয় অনেকটাই অগোছালোভাবে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করে ফেলেছি। তবে হয়তো এর মধ্য দিয়েই ডি.কে.-র ক্রিয়াকর্মের নানা দিক ফুটে বেরুবে। সিগনেট বুকশপে শুধু যে নিজেদের প্রকাশিত বই-ই সাজানো থাকত, তা নয়— সেও সাজানো থাকত অসামান্য সৌন্দর্য সৌকর্য নিয়ে— থাকত অন্যান্য প্রকাশকের গুরুত্বপূর্ণ বইও। ততদিনে আমার করা জুল ভের্ন-এর কোনও-কোনও বইয়ের তর্জমা বা পুনর্কথনও বেরুতে শুরু করে দিয়েছে, আর সে সব বইও স্থান পেত ওই সুশোভন বইয়ের তাকে। হয়তো সেই জন্যই ডি.কে. আমার নাম মনে রেখে দেবেন। বাটা কোম্পানি থেকে একটি 'হাউস জার্নাল' বেরুত, 'ঘরোয়া কাগজ', তার দায়িত্বে ছিলেন নৃপেন্দ্র সান্যাল (ওই যিনি ফ্রানৎস কাফকার একটা গোটা উপন্যাস 'বিচার' বাংলায় সবচেয়ে আগে তর্জমা করেছিলেন)। আর সেখানে প্রধানত কাজ করতেন নিত্যপ্রিয় ঘোষ, শিল্পের দিকটা দেখাশুনো করতেন পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়, আর আমার উপর দায়িত্ব পড়েছিল ইংরেজিতে হাউস জার্নাল-এ যা-যা ছাপা হবে তার সহজ সরল বাংলা করে দেবার। অবশ্য শুধু তা-ই নয়, আমাকে বাটা কোম্পানির কোনও কোনও জুতোর বিজ্ঞাপনও লিখে দিতে হত। সবই অবশ্য পরিমার্জনা করে দিতেন ডি.কে. স্বয়ং। তখন সিনেমা হলে মূল ছবি দেখাবার আগে অনেক বিজ্ঞাপন দেখানো হত। বাটা কোম্পানিরও বিজ্ঞাপন থাকত, কিন্তু ওই জুতো নিয়ে দর্শকদের মন টানার জন্যে কতগুলো ছোট ছোট গানও বেঁধে দিত হত আমায়। অলোকনাথ দে'র সুরে সে-সব গাইতেন অনুপ ঘোষাল— আর ওই গান বাঁধার উপলক্ষ্যেই ডি.কে. আমায় কয়েকবার সঙ্গে করে টালিগঞ্জের স্টুডিয়োতেও নিয়ে গিয়েছিলেন।

এ-সব কাহিনি হয়তো খুব সহজে শেষ হবার নয়। কেননা তখন তাঁর সঙ্গে যে সহজ সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, সেই সম্পর্কে তার পরে আর কখনও ছেদ পড়েনি। সত্যি বলতে তখনই তিনি আমাকে সিগনেট প্রেসের কোনও কোনও বইয়ের দেখাশুনো করতে বলেছিলেন। যেমন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা প্রতিদ্বন্দ্বী উপন্যাস সিগনেট প্রেস থেকে বেরুবে— আমাকে বইয়ের প্রুফ দিয়ে তিনি বললেন— বইটি পড়ে তার মলাটে ছাপার জন্যে একটি ব্লার্ব লিখে দিতে হবে। একটি পরিচায়িকা যেটা আবার বইটির বিজ্ঞাপনেও বেরুবে। সিগনেট প্রেস-এ প্রায় সব বইয়ের মলাটে বই ও তার লেখক সম্বন্ধে পরিচিতি বেরুত। এর আগে এ কাজ দীর্ঘদিন করেছিলেন আমারই শিক্ষক, কবি নরেশ গুহ। প্রায় গুরু-শিষ্যের পরম্পরার মতোই শেষটায় এই দায় আমারই উপর এসে কি না বর্তাল। ডি.কে.-র কেন যেন মনে হয়েছিল এই কাজ আমি করে উঠতে পারব। তো প্রতিদ্বন্দ্বী-র পরিচায়িকা লেখা হল, এমনভাবে লেখা হল যাতে সেটা শুধু বইয়ের মলাটেই নয়, বিজ্ঞাপনেও ব্যবহার করা যায়। বই বেরুবার আগেই দেশ পত্রিকার একটা পাতায় এই পরিচিতি বেরুল। আর সেটা পড়ে, আর কেউ নয়, খোদ সত্যজিৎ রায়, ডি.কে.-র সঙ্গে যোগাযোগ করে বললেন, বই বেরুবামাত্র তাঁকে যেন সেই বই পাঠিয়ে দেওয়া হয়— তিনি এই উপন্যাস নিয়ে একটি চলচ্চিত্র তৈরি করতে চান। ডি.কে. এ কথা শুনে খুব খুশি হয়ে আমাকে খবরটা দিলেন, বললেন ব্লার্বটি এত ভাল হয়েছে যে সেই ব্লার্ব পড়েই বিদগ্ধ ও সুখী পাঠকদের মধ্যে এই বইটি সম্বন্ধে কৌতূহল জেগে উঠেছে।

এই প্রসঙ্গেই তিনি সত্যজিৎ রায় সম্বন্ধে একটি কাহিনি শোনালেন। সত্যজিৎ রায়ের উপর ভার পড়েছিল বিভূতিভূষণের 'আম আঁটির ভেঁপু' বইটির ছবি আঁকবার আর সেই বইয়ের ছবি আঁকতে সত্যজিৎ রায় ওই বই নিয়ে একটি চলচ্চিত্র তৈরি করবেন বলে মনস্থির করে ফেলেন। বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালি বইয়ের একটি ছাত্র-পাঠ্য সংস্করণ বেরিয়েছিল ওই সময়েই– তার নাম ছিল 'ছোটোদের পথের পাঁচালি'। 'আম আঁটির ভেঁপু' কিন্তু তার চাইতে আলাদা। এই সংস্করণের পাঠ তৈরি করেছিলেন ডি.কে. স্বয়ং– কিন্তু তিনি তো এই সব কাজে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতেই ভালবাসতেন, তাই বইয়ের মধ্যে এসব কথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। যাই হোক, সত্যজিৎ রায় এই নিয়ে ছবি করবেন বলে ফের ডি.কে.-র সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এদিকে তখন দেবকীকুমার বসু পথের পাঁচালি নিয়ে ছবি করবেন বলে বিভূতিভূষণের স্বত্বাধিকারীদের কাছ থেকে তার চিত্রস্বত্ব কিনে নেবার চুক্তি করেছিলেন। ডি. কে.-রই তৎপরতা ও অনুরোধে দেবকীকুমার বসুর কাছে থেকে সেই স্বত্ব ফিরিয়ে এনে সত্যজিৎ রায়কেই দিয়ে দেওয়া হল। বিভূতিভূষণের বাড়ির লোকদের

সত্যজিৎ রায়/হুক্কাহুয়া

সত্যজিৎ রায়/খাই খাই

সত্যজিৎ রায়/বুড়ো আংলা

সত্যজিৎ রায়/পাগলা দাশু

গোড়ায় একটু আপত্তি ছিল, কেমন একটা অস্বস্তি। দেবকীকুমার বসু তখন এতই স্বনামধন্য। চিত্র পরিচালক যে তাঁর কাছ থেকে স্বত্বটি ফিরিয়ে এনে এমন একজনকে দিয়ে দিতে হবে বলে ডি.কে. প্রস্তাব করেছেন, যিনি জীবনে কখনও এর আগে কোনও চলচ্চিত্র পরিচালনা করেননি। তবু তাঁরা ডি.কে.-র কথামতোই সত্যজিৎ রায়কে চিত্রস্বত্ব দিয়ে দিলেন। কিন্তু এখানেই সেই ছবি বানাবার সব গণ্ডগোল মিটে যায়নি। এমন কোনও প্রযোজক পাওয়া যায়নি যিনি এই ছবির পেছনে টাকা ঢালতে রাজি আছেন, বিশেষত একজন আনকোরা নবীন পরিচালক যখন ছবিটার দায়িত্ব নিয়েছেন। ডি.কে.-ই তার পর অনেকরকম চেষ্টা-চরিত্র করে, মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়কে ধরাধরি করে, সরকারের কাছ থেকে কিছু টাকা পাইয়ে দেবার উদ্‌যোগ ও আয়োজন করেছিলেন। তবে সরকারের কোন তহবিল থেকে সে টাকা দেওয়া হবে সেটা অর্থ দফতরের বোধগম্য না হওয়ায় তারা 'পথের পাঁচালি' নাম দেখে সড়ক নির্মাণ তহবিল থেকে সে টাকা মঞ্জুর করে দেয়। পথের পাঁচালি সিনেমার গল্প কিন্তু সেখানেই শেষ হয়নি। অনেক তোড়জোড় করে জহরলাল নেহরু যাতে সেই ছবি দেখেন তার একটা বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। যে প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন অনেক মান্যগণ্য দর্শক। নেহরু সেই ছবি কতটা দেখেছিলেন কে জানে। তিনি তাঁর আসনে হয়তো চোখ বুজেই ঘুমুচ্ছিলেন। কিন্তু ছবি শেষ হবামাত্র হাততালির আওয়াজ শুনে তিনিও চোখ খুলে হাততালি দিতে শুরু করে দেন। আর সত্যজিৎ রায়ের দারুণ তারিফ করেন। সত্যি-মিথ্যে জানা নেই, এ সব গল্প খোদ ডি.কে.-র কাছ থেকেই শোনা, যখন তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা গাঢ় হয়ে উঠেছে।

'প্রতিদ্বন্দ্বী' যখন সিগনেট প্রেস থেকে বেরোয় তখন সেই সঙ্গে সিগনেট প্রেস আমার প্রথম কবিতার বইটিও— ডি. কে.-রই তাগিদে– তার নাম 'অর্ধেক শিকারী'। যাতে মলাট এঁকে দিয়েছিলেন আমাদের সকলেরই বন্ধু পূর্ণেন্দু পত্রী। সিগনেট প্রেস থেকে যাঁদের প্রথম কবিতার বই বেরিয়েছিল সেই তালিকায় এই নামগুলো আছে– নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'নীলনির্জন', নরেশ গুহর 'দুরন্ত দুপুর'। আমার বইয়ের নামের মধ্যে অবিশ্যি কোনও অনুপ্রাস ছিল না। পরে ডি.কে.-র তাগিদে আমায় সিগনেট প্রেস-এর আর একটি বইয়ের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল, সম্ভবত সেটাই ছিল সিগনেট প্রেস প্রকাশিত শেষ বই : 'মহাপৃথিবী', জীবনানন্দ দাশের। তখন ডি.কে. আর এলগিন রোডে থাকেন না, তাঁর বাসস্থান তখন ২৫/৪ মহম্মদ একবালপুর রোড, কলকাতা-২৩। এই বইয়ের আশ্চর্য মলাট এবং তার নামপত্র এঁকেছিলেন পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়। আর বইটি সম্পাদনা করার ভার দেওয়া হয়েছিল আমার উপর। বনলতা সেন প্রথম বেরোয় বুদ্ধদেব বসুর প্রযোজনায়, কবিতাভবন থেকে– এক পয়সায় একটি কবিতা সিরিজের অংশ হিসেবে। পরে যখন 'বনলতা সেন' সিগনেট প্রেস থেকে বেরোয় তখন তাতে 'মহাপৃথিবী' থেকে ১৪ টি কবিতা নিয়ে এসে সেই বইয়ের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল, কারণ তারা সবসময়েই রচিত হয়েছিল, আর কবিতার ধরন, বাঁধুনি আর সুর ছিল একই রকম। এবারে মহাপৃথিবী বার করতে গিয়ে আমি সেই সরিয়ে নেওয়া ১৪টি কবিতার জায়গায়, সমসময়ে রচিত কিন্তু গ্রন্থাকার অমুদ্রিত ১৪ টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত করি। শুধু এই কবিতাগুলো যে 'মহাপৃথিবী'র সিগনেট প্রেস সংস্করণে মুদ্রিত হল, এই কথা বোঝাবার জন্যে 'আমিষাশী তরবার' নামে একটি আলাদা খোপ তৈরি করে প্রকাশ করা হয়েছিল। আর এই বইয়ের প্রায় তাৎক্ষণিক সাফল্য হিসেবেই বাড়তি

পাওয়া হিসেবে জীবনানন্দ দাশের কন্যা শ্রীমতী মঞ্জুশ্রীর সঙ্গে আমার আলাপ ও বন্ধুতা হয়। তখনও অবশ্য ভূমেন্দ্র গুহ-র সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি। তিনি তখন চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়েই সারাক্ষণ ব্যস্ত। আজ ভাবি, তখন যদি ভূমেন্দ্র গুহর সঙ্গে আমার পরিচয় থাকত, তাহলে ওই 'আমিষাশী তরবার' অংশটুকু হয়তো অন্যরকম হয়ে যেত। কিন্তু ডি.কে.-কে অন্তত তখন যতটুকু আমাদের জানা ছিল, তারই প্রেক্ষিতে এইভাবেই বইটা বের করতে উৎসুক হয়েছিলাম।

সিগনেট প্রেস-এর কথা বলতে গেলে হয়তো অনেক সময় লেগে যাবে। আমরা যখন স্কুলে পড়ি তখন থেকেই সিগনেট প্রেস-এর ছোটদের বইয়ের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতুম। বিশেষত আমরা যারা মফস্‌সলে বড় হয়েছি। সুকুমার রায়ের বই (তিনি তো শুধু 'আবোল তাবোল'-এর মুদ্রণ অবধি, প্রকাশনা নয়) দেখেছিলাম। 'হযবরল', 'ঝালাপালা' বা অন্য সব এখান থেকেই বেরিয়েছিল। বেরিয়েছিল অবনীন্দ্রনাথ, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র-র 'কুমির! কুমির!' বুদ্ধদেব বসুর 'হাউই', লীলা মজুমদারের 'দিনদুপুরে', 'পদীপিসির বর্মিবাক্স', মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের তর্জমায় 'অল কোয়াইট ইন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট'— আরও কত-কত বই। বড়দের জন্যে বইয়ের বাহারও মোটেই কম ছিল না। আর বেরিয়েছিল তর্জমাতেই ডি.এইচ, লরেন্সের গল্প, 'পিরানদেল্লোর গল্প', 'সমারসেট মমের গল্প'। ইংরেজিতে বেরিয়েছিল বাংলা কবিতার একটি তর্জমা সংকলন, একটি গল্পের সংকলনও। সিগনেট প্রেসই বের করেছিল চলচ্চিত্র সম্বন্ধে সচিত্র আলোচনার সংকলন। কিন্তু এই লেখাটাকে নিছক গ্রন্থতালিকা বলে ধরে নিলে ভুল করব। ডি.কে.-ই আয়োজন করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হল-এ দু-দিন ব্যাপী আধুনিক বাংলা কবিতা পাঠের আয়োজন। তাতে এমনকি স্বভাবলাজুক জীবনানন্দ দাশও দু-দিন উপস্থিত থেকেছিলেন— অন্যরা তো ছিলেনই। আধুনিক বাংলা কবিতার প্রচার ও প্রসারের জন্য তাঁর উদ্‌যোগ উৎসাহের কমতি ছিল না। তিনিই বৈশাখ মাসে ঘোষণা করেছিলেন কবিপক্ষ-র। কবিপক্ষ-এ শুধু পুরনো কবিতার বই-ই পাওয়া যেত না। প্রকাশিত হত নতুন-নতুন কবিতার বইও। এমনকি সিগনেট প্রেস-এ পাওয়া যেত অন্য প্রকাশকদের প্রকাশ করা সব কবিতার বই— অন্তত ওই কবিপক্ষ-র সময়। 'টুকরো কথা'-র মধ্যে যে 'সাহিত্য প্রাসঙ্গিক সমস্যা' বিভাগ ছিল সেটাও উৎসাহী তরুণ পাঠকদের খুব মন টেনেছিল— অনেকটাই সেই সমস্যার সমাধান জানিয়ে চিঠি দিতেন— আর তাঁদের চিঠির অংশবিশেষ পরের সংখ্যায় ছাপাও হত। কাগজে বাঁধাই (পেপারব্যাক) বই বেরোত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স থেকে, বিশ্বভারতী থেকে। কিন্তু সিগনেট প্রেসের কাগজে বাঁধাই বইয়ের রূপটাই ছিল ভিন্নতর। আর আধুনিক কবিদের

সত্যজিৎ রায়/শ্রীমতী

সত্যজিৎ রায়/রূপসী বাংলা

সত্যজিৎ রায়/টুনটুনির বই

সত্যজিৎ রায়/অর্কেস্ট্রা

কবিতার বইয়ের জন্যে কী যে তিনি করেছিলেন, তার লেখাজোখা নেই। কৃত্তিবাস যখন প্রথম বেরোয়, তখন তিনিই তার কাগজ জুগিয়েছিলেন, ছাপার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পত্রিকার জন্যেও তিনি শুধু বিজ্ঞাপনই নয়, অনেকবার কাগজ জুগিয়েছিলেন। হরবোলা নামে একটি নাটকের দলও তিনি খাড়া করেছিলেন তরুণদের নিয়ে, যার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন কমলকুমার মজুমদার। 'হরবোলা' সুকুমার রায়ের নাটক দিয়েই তাদের যাত্রা শুরু করতে চেয়েছিল।

প্রকাশ সৌষ্ঠবের জন্যে—কে না জানে— সিগনেট প্রেস-এর বইগুলোর কোনও তুলনা হত না। মুদ্রণ, বাঁধাই, মলাট—সবকিছুতেই বৈশিষ্ট্য থাকত। আর ছবি আঁকতেন শুধু সত্যজিৎ রায় নয়, অন্নদা মুনশির মতো চিত্রকরেরাও। এই সব কিছুরই প্রকাশ ছিল বহিরঙ্গে। কিন্তু ডি.কে. থাকতেন অন্তরালে। তিনি কখনও উল্লেখও করেননি জিম করবেটের তর্জমা— বা অন্য অনেক অনুবাদ, বা 'আম আঁটির ভেঁপু'তে তাঁর নিজেরই অবদান অসামান্য।

সমস্তটাই ছিল এক রুচির ব্যাপার। বুদ্ধদেব বসু যখন ঢাকা থেকে প্রথম কলকাতায় এলেন, তখন তাঁর রুজি-রোজগারের অনটনের দিনে সাহায্য করেছিলেন ডি.কে.-র পরিবারের নীলিমা দেবীরা। আর বুদ্ধদেব বসু তরুণ প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ডি.কে.-র গৃহশিক্ষক ছিলেন তেমনই আর একজন গৃহশিক্ষক ছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। আর এই গৃহশিক্ষকদের সৌজন্যেই হয়তো ডি.কে.-র সাহিত্য শিল্পের স্পৃহা অন্যরকম হয়ে উঠেছিল। ভিন্ন হবার জন্যেই ভিন্নত্ব নয়, রুচির সমগ্রতার সন্ধানেই ভিন্নতা, অনন্যতা। পরে তাঁর এলগিন রোডের বাড়িতে শনিবার সন্ধ্যায় গানের আসর বসত, তাঁর সংগ্রহে ছিল কত-যে আশ্চর্য গান! রবীন্দ্রসংগীত, ধ্রুপদি গান, মার্গসংগীত। আর সেইসব আসরে প্রায় নিয়ামিতই যেতেন অম্লান দত্ত, অরুণকুমার সরকার, ত্রিদিব ঘোষ, যতীন্দ্র মিত্র, নিরুপম চট্টোপাধ্যায়, নরেশ গুহ— কলকাতায় যদি থাকতেন কখনও, তবে অশোক মিত্রও।

ডি.কে.-র মৃত্যুর পর নরেশ গুহ ছোট্ট একটি স্মৃতি কথা লিখেছিলেন দেশ পত্রিকায়। পরে বিভাব পত্রিকায় সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ডি.কে.-কে নিয়ে আস্ত একটি সংখ্যা বের করেছিলেন, যাতে টুকরো কথাও ছিল অনেক। আমি এলগিন রোড নয়, একবালপুর রোডের বাড়িতে অনেকবার গিয়েছি। তার আগে রঘুনাথ গোস্বামীর আয়োজনে, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ও দিলীপকুমার গুপ্তর সম্পাদনায় বেরিয়েছিল সারস্বত প্রকাশ পত্রিকা— যার সাত-আটটি সংখ্যাই বোধ হয় বেরিয়েছিল। কিন্তু এখনও সেই পুরনো সংখ্যাগুলো দেখলে মনে হয়— হায়রে। এমন কেন সত্যি হয় না আর? সারস্বত প্রকাশ-এর সূত্রেও ডি.কে.-র সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হত। আলোচনা হত কেমন করে ওই কাগজটিকে ভাল, আরও ভাল করে তোলা যায়। তবে, ওই যে, হায়রে, ভাল জিনিস বোধ হয় বেশিদিন থাকে না। তাই ওই কাগজও উঠে গেল, কিন্তু ডি.কে.-র স্নেহ থেকে আমি বঞ্চিত হইনি। বেশ কয়েকবারই তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে একবালপুর রোডের বাড়িতে গিয়েছি। এমনকি ডি.কে.-র অসুস্থ হবার খবর শুনেও হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গিয়েছিলুম সেখানে। তখন সিগনেট প্রেস নেই, সারস্বত প্রকাশ নেই, বাটা কোম্পানির ঘরোয়া কাগজও নেই। কিন্তু তবু ছিল এক অবুঝ টান— আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসার, তাঁর স্নেহ ও দাক্ষিণ্যের।

প্রচ্ছদ শিল্পের কবি পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রণবরঞ্জন রায়

পূর্ণেন্দু পত্রীর সৃজন ক্ষমতা বিস্ময়কর ভাবে বহুমুখী। তিনি কবি, উদ্ভাবনী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যবহারিক চিত্রকর, শহর কলকাতার ইতিবৃত্তকার, কিশোর সাহিত্যিক, চলচ্চিত্র নির্মাতা, শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধকার। এর মধ্যে কোনটিতে তাঁর অধিকার এবং সাফল্য অধিক, কোনটির জন্যই বা তিনি সময় বেশি দেন, কোনটি তাঁর বেশি প্রিয় তা বলা রীতিমতো কষ্টকর। তবে তাঁর নিজের জীবনের কালানুক্রমে কবি পূর্ণেন্দুর পরেই আসেন চিত্রী তথা ফলিত চিত্রকর পূর্ণেন্দু পত্রী। এই স্বশিক্ষিত শিল্পীর শিল্প প্রতিভার প্রথম সাক্ষ্য ১৯৫০-এ প্রকাশিত 'সুকান্তনামা'র প্রচ্ছদ। তাঁর ক্ষেত্রে ওই প্রথম প্রকাশ থেকে প্রতিষ্ঠালাভ পর্যন্ত দূরত্ব খুব একটা বেশি ছিল না। যদিও হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেই সে দূরত্ব তাঁকে পেরোতে হয়েছিল।

পূর্ণেন্দু পত্রী/আমার রবীন্দ্রনাথ

ব্যবহার্য বস্তুতে শিল্পকলার প্রকাশ ঘটতে পারে নানা রূপে, বিচিত্রভাবে। শিল্পী বস্তুর গড়নে, গঠনে, অলংকারে, নকশায়, সজ্জানে কিংবা অবচেতন ভাবে সৃজনশীলতার সাক্ষ্য রাখতে পারেন। পূর্ণেন্দু কিন্তু শিল্পের তাবৎ ব্যবহারিক প্রয়োগ নিয়ে ভাবিত নন। শুধুমাত্র দ্বিমাত্রিক সত্তাযুক্ত পঠনযোগ্য বস্তুকে দৃষ্টিনন্দন ও অভিব্যক্তিময় করে উপস্থাপন করার জন্য পূর্ণেন্দু তাঁর কলাসৃষ্টিক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েছেন। অর্থাৎ— বই, পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা, আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ পত্র, বিজ্ঞাপন পত্র ইত্যাদির পাঠ্যবস্তুকে দৃষ্টিগ্রাহ্য ভাবে স্বাদু করা এবং তন্মধ্যস্থ বিষয়বস্তুর খানিকটা দৃষ্টিগ্রাহ্যসত্তা দেবার জন্য পূর্ণেন্দু তাঁর শিল্পদক্ষতাকে নিয়োগ করেছেন।

পূর্ণেন্দু পত্রী/আন্তর্জাতিক

মধ্যযুগের বাঙালি পুঁথির ভিতরে ছবি আঁকেননি, কিন্তু পারলেই পুঁথির কাঠের পাটায় ছবি এঁকেছেন। চিত্রিত পাটাই হল আধুনিক প্রচ্ছদের বা মলাটের পূর্বসূরী। পূর্ণেন্দু সেই আদি যুগের পুথিঁ আঁকিয়ে আর মধ্যযুগের বাঙালি পাটা-চিত্রকরদের আধুনিক উত্তরসূরী। কালীঘাটের পটুয়াদের, চিৎপুরের কাঠখোদাইকারদের আর অবনীন্দ্রনাথ— রবীন্দ্রনাথ— নন্দলাল— জীবনানন্দ—বিষ্ণু দে— শঙ্খ ঘোষের গুণগ্রাহী পূর্ণেন্দু স্বভাবতই অত্যন্ত ঐতিহ্যসচেতন। তাঁর সৃষ্ট পুস্তক, পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকার অঙ্গসজ্জায় এই ঐতিহ্যচেতনা স্বপ্রকাশ। ব্যবহারিক চিত্রকর হিসাবে পাঠ্যপুস্তককে দৃষ্টিনন্দন করে তোলার দায়িত্বকে অগ্রাধিকার দিয়ে পূর্ণেন্দু কী প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে তাঁর চৈতন্যের শিকড় সেই অন্ধকার অতীতের গভীরে প্রসারিত?

পূর্ণেন্দু পত্রী/হাজার বছরের প্রেমের কবিতা

সত্যজিৎ রায়, খালেদ চৌধুরীর অব্যবহিত পরবর্তীকালের সবচেয়ে উদ্ভাবন প্রতিভাসম্পন্ন, সবচেয়ে বহুপ্রজ এবং পূর্ববর্তী সবার চেয়ে অনেক বেশি বৈচিত্র্যময় ব্যবহারিক শিল্পী এই পূর্ণেন্দু পত্রী এবং সবচেয়ে যা বিস্ময়কর তা হল পূর্ণেন্দুকৃত বিপুলসংখ্যক মলাট ও পত্র-অলংকারের শৈলীগত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও পূর্ণেন্দুর স্বকীয়তা কোথাও ম্লান নয়। নানা শৈলীতে নানা ধরণে আঁকা প্রতিটি কাজই যে পূর্ণেন্দুর তা প্রায় দেখা মাত্রই ধরা পড়ে। এটাই বোধহয় জাত শিল্পীর অন্যতম চরিত্রলক্ষণ।

এর আগেই একবার বলা হয়েছে, পূর্ণেন্দু অত্যন্ত ঐতিহ্যসচেতন শিল্পী। তার মানে অবশ্যই এ নয় যে তিনি তদ্‌গতচিত্তে চারুশিল্প বা কারুশিল্পের কোনও বিশিষ্ট পরম্পরার অনুসৃতিতেই নিজেকে নিবদ্ধ রেখেছেন। তবে সুযোগ থাকলেই পূর্ণেন্দু দেশজ চারু অথবা কারুশিল্পের রূপবন্ধ নির্মাণ পদ্ধতির, অলংকরণ পদ্ধতির এবং চিত্রবিন্যাসরীতির দ্বারস্থ হয়েছেন। কখনও কালানুষঙ্গ কখনও বা আবহ-অনুষঙ্গ সৃষ্টির তাগিদে কখনও অভিব্যক্তি কখনও বা শুধুমাত্র নকশা অলংকার সৃষ্টির তাগিদে পূর্ণেন্দু দেশজ চারু বা কারুশিল্পের শৈলী, আঙ্গিক, প্রথা, পদ্ধতি, রীতিনীতি, রূপের দিকে ফিরেছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়' এ বালুচরী শাড়ির নকশার ব্যবহার কালানুষঙ্গ সৃষ্টির কারণে তো অবশ্যই, অলংকার বহুল নকশার জন্যও। আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৯৭৮-এর বিজয়ার সম্ভাষণজ্ঞাপক পত্রের নকশায় করজোড়ে দণ্ডায়মান বাংলার লৌকিক পুতুলমূর্তির পৌনঃপুনিক ব্যবহার তৎসহ প্রস্তরফলকে খোদাই করা নাগরীলিপি ধাঁচের বাংলা হরফের ব্যবহার যতটা নকশা গঠনের দাবীর দ্বারা নির্ধারিত, ততটা অনুষঙ্গ সৃষ্টির কারণে নয়। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'মন্ত্রের মতন আছি স্থির'এ গেরুয়া জমির উপরে লাল অক্ষরগুলি যেন কাঠের ব্লকে ছাপা নামাবলী, অক্ষরের নকশার পিছনে ধ্যানমগ্ন ব্যক্তির আবছা আভাস। এই নকশাটি ব্যঞ্জনামূলক বা অভিব্যক্তিধর্মী শ্রীপান্থের 'দেবদাসী'র মলাটে ফিল্মস্ট্রিপের কায়দায় সাজানো মন্দিরগাত্রের নৃত্যরতা নারীমূর্তির ফটোগ্রাফিক কোলাজ সরাসরি বর্ণনাত্মক সমন্বয়ে, সাযুজ্যে আস্থাবান পূর্ণেন্দুর কাছে কোনও ঐতিহ্য, কোনও পরম্পরাই অস্পৃশ্য নয়। প্রাসঙ্গিকতা থাকলে তিনি যে কোনও শৈলীর রীতি থেকেই উপাদান গ্রহণ করেন। প্রমথনাথ বিশীর 'জোড়াদিঘীর উদয়াস্ত'তে বাংলা অক্ষরকে গথিক ধাঁচে ফেলেছেন ইউরোপীয় উপনিবেশিক শক্তির ছত্রছায়ায় লালিত বিগত দিনের বাংলার ভূম্যাধিকারী সংস্কৃতির চরিত্রে দৃশ্যসংকেতে ধরার জন্য। বরুণ সেনগুপ্তের 'পালা বদলের পালা'য় সরাসরি পিকাসোর গোয়েরনিকা ম্যুরালের ধরনের ছবি এঁকেছেন সমভাবানুষঙ্গ সৃষ্টি করার জন্য।

ঐতিহ্য বা পরম্পরা দেশজই হোক আর বিদেশিই হোক সেটা বড় কথা নয় যে পূর্বস্থিত উপাদানকে নকশা গঠনের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে তা প্রাসঙ্গিক কিনা তাই বিচার্য। অল্প একটু আলোচনা করেই দেখেছি যে পূর্ণেন্দু অপ্রাসঙ্গিকভাবে কোনও পরম্পরাগত উপাদান সাধাণত ব্যবহার করেন না। দ্বিতীয়ত এ প্রসঙ্গে অন্য যে কথাটি অনিবার্যভাবে এসে পড়ে তা হল, বিশিষ্ট প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে হলে যে-কোনও পরম্পরান্তর্গত উপাদানকেই রূপান্তরিত করে নিতে হয়। রূপান্তরের আবশ্যিকতা এজন্য যে মূল শৈলীর

সৃষ্টি ও কাজের প্রসঙ্গ ভিন্ন। পূর্ণেন্দুর কাজের প্রতি একটু নজর দিলে দেখা যাবে যেখানে আহুত উপাদানের রূপ অনেকটা পরিবর্তিত সেখানে পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে প্রসঙ্গান্তরের অভিব্যক্তি কিংবা ব্যঞ্জনার স্বার্থে। রূপান্তর অবশ্য অনেকভাবেই ঘটিয়েছেন পূর্ণেন্দু। ধরা যাক্ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়' কিংবা প্রমথনাথ বিশীর 'জোড়াদিঘীর উদয়াস্ত'-র মলাটে বালুচরী শাড়ির ধরনের নকশার কথা। বালুচরী শাড়ির নকশায় মাত্রা যোজন নিয়ে যেসব প্রতিম্বিক রূপবন্ধ দেখা যায় তাদের পোষাক-আসাক, ব্যবহার-ভঙ্গিমা এবং পাত্রপাত্রীর বস্তুব্যবহারে একটা কালের ছাপ দেখা যায়। পূর্ণেন্দুর অন্বিষ্ট সেই কালানুষঙ্গ। তাই তিনি বালুচরী শাড়ির রূপকলা পরিকল্পনার ধাঁচটি গ্রহণ করেন কিন্তু বাদ দেন বালুচরী নকশা তৈরির বুনটের জেল্লা ও বিশদ, যেটা শাড়ির পক্ষে জরুরী, তাঁর জন্য নয়। ১৩৭৭-এর, দেশ, বিনোদন সংখ্যার মলাটে কিষণগড় রাধার ছবির সঙ্গে আর ন্যুভো ধাঁচের বাংলা হরফের মেলবন্ধন নকশা-অলংকারের খাতিরে। রাধার হাতের আর ঘুঙ্ঘটের আলংকারিক বঙ্কিম চাপল্য অক্ষরের আর-ন্যুভো রেখার বঙ্কিম গতির কল্যাণে শতগুণ বর্ধিত। শুধু তাই নয় যে ছন্দানুবৃত্তিরই প্রধান সহায়। একটু অভিনিবেশ সহকারে ওর কাজ দেখলে মনে হয় দেশজ উচ্চকোটির কিংবা লৌকিক অথবা বিদেশি কারু ও চারু শিল্প রীতি ও শৈলীর মধ্যে সেসবের প্রতি তাঁর পক্ষপাত বেশি যেসব রীতি ও শৈলী তুলনামূলকভাবে একটু আলংকারিক বা যেসবের আলংকারিক সম্ভাবনা কিঞ্চিৎ বেশি। আমদের দেশজ লৌকিক কারুশিল্প স্বভাবতই অলংকারসমৃদ্ধ হবার কারণে পূর্ণেন্দু একটু বেশি পরিমাণে তার দিকে ঝোঁকেন। সাধারণ প্রবণতার কথা একটু মূলতবি রেখে পূর্ণেন্দুর প্রচ্ছদ ও পত্রালংকার গঠনের বিশদের নজর দেওয়া যাক। পূর্বসূরী নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায় ও খালেদ চৌধুরীর মতো পূর্ণেন্দুও বাংলা অক্ষরের ছাঁদের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে ভেবেছেন এবং তা নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন সারা জীবন।

বাংলা ছাপার হরফের ছাঁচের প্রকারভেদ ভয়াবহ রকম কম। তাছাড়া, সহজলভ্য ছাপা হরফের ছাঁদের রূপান্তরসম্ভাবনা এতই সীমাবদ্ধ যে সেসব হরফের সাহায্যে আলংকারিক বা ব্যঞ্জনাধর্মী নকশা গঠন করা প্রায় অসম্ভব। পূর্ণেন্দু ছাপা হরফের ছাঁদ তাঁর করা মলাট, আমন্ত্রণলিপি, শিরোভূষণ (হেডপিস) ইত্যাদিতে কম ব্যবহার করলেও অনেক পূর্বসূরীর মতন একেবারে বাদ দেননি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়', চিত্তরঞ্জন ঘোষের 'বিভূতিভূষণ', 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা', কেতকী কুশারি ডাইসনের 'বল্কল' ইত্যাদি বইয়ের প্রচ্ছদে পূর্ণেন্দু স্বচ্ছন্দে সহজ লভ্য ছাপার হরফ ব্যবহার করেছেন। আবু সয়ীদ আয়ুবের 'গালিবের গজল থেকে'-তে হ্রস্ব-ই চিহ্নের শীর্ষকে পারসিক ছবি কিংবা গালিচার রেখা কল্কে ফুলের চেহারা দিয়ে বাংলা ছাপার হরফের একটা ব্যঞ্জনাময় রূপান্তর ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। বিষ্ণু দে'র 'সেই অন্ধকার চাই'-এর প্রচ্ছদে সেই এবং চাই শব্দ দুটি ছাপার হরফে লিখে অন্ধকার শব্দটিকে লিখে দিয়েছেন ভঙ্গি ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ ক্যালিগ্রাফিক রেখায়। তবে, এটা লক্ষ্যনীয় যে যেখানেই তিনি নামাঙ্কনে বা বাণী লিখনে ছাপার হরফ ব্যবহার করেছেন, সেখানেই পূর্ণ অভিঘাতের জন্য অক্ষর ভিন্ন অন্য উপাদানের উপর অনেক বেশি

নির্ভর করেছেন। 'সেই সময়' এ বালুচরি শাড়ীর ধরনের নকশা, 'বিভূতিভূষণ'এ সবুজ রঙের নানা বর্ণান্তর, 'সেই অন্ধকার চাই'এ অন্ধকার শব্দের রং ও ক্যালিগ্রাফিক লাইনের দ্যোতনাময় ভঙ্গিমা, 'বঙ্কলে'র প্রচ্ছদে কাঠের বুনোটের চেহারার নকশা ইত্যাদিই প্রচ্ছদগুলির মূল চরিত্র নির্ধারণ করে, নাম বিজ্ঞাপন ছাপার হরফগুলি নয়।

অথচ পূর্ণেন্দু শুধুমাত্র অক্ষর সাজিয়ে অথবা অক্ষরকে প্রাধান্য দিয়ে আলংকারিক কিংবা অভিব্যক্তিময় নকশা নির্মাণ করতে পারেন। সেসব ক্ষেত্রে তাঁকে তাঁর হাতের কারিগরির উপর নির্ভর করতে হয়, ছাপার হরফ সেসব জায়গায় অচল। ইন্দ্র মিত্রের 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর', বুদ্ধদেব বসুর 'প্রবন্ধ সংকলন', দেবেশ রায়ের 'দুই দশক' সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক', 'যত দূরেই যাই', শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'পরশুরামের কুঠার', 'চতুর্দশপদী কবিতা', শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'মা নিষাদ', নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'অন্ধকার বারান্দা' ইত্যাদি বইয়ের প্রচ্ছদ গঠন করা হয়েছে মূলতঃ অক্ষরের ছাঁদ ও রঙের সাহায্যে। হ্যাঁ, রঙের ব্যবহার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রঙ দিয়ে আলো, আঁধার, ঔজ্জ্বল্য, প্রভাহীনতা, উষ্ণতা, শীতলতার অনুভব সঞ্চার পূর্ণেন্দুর পক্ষে বড়োই জরুরী।

পূর্ণেন্দুর অক্ষরপ্রধান কাজগুলির মধ্যেও বেশ কয়েকটি ধারণ দেখা যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক'-এ নাম জ্ঞাপক শব্দের অক্ষরসমষ্টির চেহারা এমন করে গঠন করা হয়েছে যাতে মনে হয় নিশান হাতে মিছিলে সামিল একটি লোক পা বাড়িয়ে এগোচ্ছে। শান্তি লাহিড়ীর 'বন্দী ময়না কথা কয়না'তে শব্দ কটি পংক্তিভেঙ্গে এমন করে গঠন করা হয়েছে যাতে মনে হয় প্রতিটি শব্দ যেন আকাশের বিভিন্ন দূরত্বের বা উচ্চতার উড়ন্ত মুক্ত পাখি। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'পরশুরামের কুঠার'-এর 'প' আদ্যক্ষরটি কুঠারের রূপ পায়। শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'মা নিষাদ' বইটির প্রচ্ছদে স্বরবর্ণ চিহ্নগুলি অন্ত প্রসারিত করে শরচিহ্নে শেষ করা হয়েছে। এসব প্রচ্ছদের প্রতিটিতে বাংলা অক্ষরের ছাঁদকে এমনভাবে রূপান্তরিত করা হয়েছে যাতে একটি অক্ষর, কয়েকটি অক্ষর বা অক্ষর সমষ্টি একটি বা একাধিক বস্তুর রূপকল্প বা রূপাভাস বা রূপবন্ধে পরিণত হয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'যত দূরেই যাই' বইটির প্রচ্ছদ যদিও অক্ষর প্রধান এবং খানিকটা পূর্বোক্ত বইগুলির মতন, তবুও একটু আলাদা। এই বইটির মলাটে গেরিমাটি রঙের জমির উপর বইয়ের নামের প্রতিটি শব্দকে ভেঙে ভেঙে অক্ষরগুলোর আকার বড় থেকে ক্রমশ ছোট করে এনে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে রাস্তার দূরত্ব অনুভূত হয়। এ-মলাটে অক্ষর কোনও রূপকল্প গঠন করেনি, অক্ষরের শরীর এমনভাবে গঠন করা হয়েছে তা যেন দূরত্বের ইঙ্গিত দেয়। মূলত অক্ষরনির্ভর যেকটি মলাট পূর্ণেন্দু এঁকেছেন তার মধ্যে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'অন্ধকার বারান্দার' প্রচ্ছদ অন্যতম শ্রেষ্ঠ। এখানে অক্ষরকে জোর করে রূপকল্পে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেননি যাতে করে অক্ষরকে অক্ষর বলে শনাক্ত করতে কষ্ট হয় এবং শেষ পর্যন্ত আবার ছাপার হরফ বসিয়ে বইয়ের নামটি দ্বিতীয়বার লিখতে হয়। 'অন্ধকার বারান্দা'য় অক্ষর নিজ চরিত্রে স্থির। কিন্তু সেই অক্ষরকে ঢালাইকরা লোহার

গ্রিলের আর অক্ষরের মাত্রাকে বারান্দায় রেলিং-এর চেহারা দেবার ফলে বইয়ের নামটি বারান্দার রূপ পায়। কিন্তু এই প্রাপ্তিতে রঙের গুরুত্ব বড় কম নয়। গাঢ় কালচে-খয়েরি জমির উপর প্রায় সাদায় লেখা নামটি বারান্দাটিকেই অন্ধকার মুড়ে দেয়। অক্ষরের রেখার অলংকার ফাঁকে ফাঁকে কখনও উজ্জ্বল হলুদ, কখনও বা লাল আলোর আভাস আবহের অন্ধকার কেই গাঢ়তর করে।

অক্ষরপ্রধান প্রচ্ছদগুলির মধ্যে আর একটি ধরণ দেখা যায় যেখানে পূর্ণেন্দু কালিক, সামাজিক ও স্থানিক পরিমণ্ডলকে ইঙ্গিতে আভাসিত করার জন্য অনুসঙ্গে সমৃদ্ধ লিপির ছাঁদ ব্যবহার করেন আধুনিক বাংলা অক্ষরের। প্রমথনাথ বিশীর 'জোড়াদিঘীর উদয়াস্ত'-তে ব্যবহৃত গথিক ছাঁদে বাংলা অক্ষরের কথা আগেই বলেছি। বিষ্ণু দের 'উর্বশী ও আর্টমিস' এর নামাঙ্কনে হেলেনিষ্টিক ও সেরাসেনিক স্থাপত্যের আদল ব্যবহারের উদ্দেশ্য প্রতীচ্য ও প্রাচ্যদেশীয় ধ্রুপদী ঐতিহ্যের স্মৃতিময় অনুষঙ্গ জাগরুক করা।

অক্ষরপ্রধান নয় এমন সব প্রচ্ছদেও পূর্ণেন্দু অক্ষরের ছাঁদ নিয়ে চমকপ্রদ কাজ করেছেন। ১৩৭৭-এর দেশ, বিনোদন সংখ্যা-র মলাটের কথা তো আগেই বলেছি। শঙ্খ ঘোষের 'আদিম লতাগুল্মময়'-এ শিলালিপি চরিত্রের অক্ষরের সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রের ধরণের সংকেতধর্মী (প্রতীকধর্মী নয়) রূপবন্ধের সমাহারে আদিমতার যে আবহ পূর্ণেন্দু সৃষ্টি করেছে তা সত্যিই বিস্ময়কর।

উপরোক্ত নানা ধরণের অক্ষর প্রধান কাজের সঙ্গে যদি নিরাভরণ জমির উপরে ক্যালিগ্রাফিক রেখায় আঁকা অক্ষরের রচিত মলাটগুলির তুলনা করি তখন শেষোক্তগুলির অসাফল্য চোখে লাগে। পূর্ণেন্দুর এ ধরণের কাজের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে বুদ্ধদেব বসুর 'প্রবন্ধ সংকলন' এবং দেবেশ রায়ের 'দুই দশক'-এর মলাট। এই দুইটি বইয়ের মলাট রচিত হয়েছে এমন রেখাঙ্কিত অক্ষর দিয়ে যে রেখা ভঙ্গিপ্রধান ও দ্বিতীয়বার যে রেখা কিছুতেই অবিকল এক রকম করে টানা সম্ভব নয়। এই ধরণের রেখাঙ্কণের সার্থকতা নির্ভর করে দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্রের উপর তার প্রক্ষেপনের উপর এবং দ্বিতীয়ত রেখার নির্ভেজাল আবেগ অভিব্যক্ত করার ক্ষমতার উপর। পূর্ণেন্দু আদতে তাৎক্ষণিক আবেগ প্রকাশক শিল্পী নন। মেজাজে তিনি ধীর স্থির নির্মাণ প্রবণ কারুশিল্পী। ফলে তার হাতে নিরাভরণ অভিব্যক্তিধর্মী কাজের চেয়ে অলংকার সমৃদ্ধ নকশা বেশি খোলে।

পূর্ণেন্দু পত্রী/প্রবন্ধ সংকলন

পূর্ণেন্দু পত্রী/শব্দের বিছানা

পূর্ণেন্দু পত্রী/স্থান কাল পাত্র

পূর্ণেন্দু পত্রী/সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা

পূর্ণেন্দুর আঁকা একটি মলাট নানা কারণে আমাদের অভিনিবেশ দাবি করে। একটু যত্ন করে এই মলাটটির নির্মিত বিশ্লেষণ করলে পূর্ণেন্দুর সার্থক কাজগুলির সার্থকতার কারণ বোঝা যাবে বলে বিশ্বাস করি। আলোচ্য প্রচ্ছদটি ইন্দ্র মিত্রের 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' গ্রন্থের প্রচ্ছদের শীর্ষে গ্রন্থের নাম উনবিংশ ও বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলা প্রকাশনালয় বহুল পরিমাণ ব্যবহৃত ভিক্টোরিয় ইংল্যান্ডে প্রচলিত অলংকারবহুল রোমান হরফের ধাঁচে গঠিত অক্ষরের সাহায্যে লিখিত। তার নীচের তিন চতুর্থাংশের ভূমির অনেকটা পুরনো হলদে হয়ে যাওয়া জলের আর শ্যাওলার ছোপধরা দুমড়ানো কাগজের মতন। আর সেই কাগজে লাইনের পর লাইনে আনুভূমিক ভাবে ছড়ানো (কিন্তু সমান্তরাল ভাবে সাজানো নয়) ঈশ্বরচন্দ্র শর্মণের সইয়ের ফ্যাকসিমিলি। লিপিসৌন্দর্যে সে সই এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দাবি করতে পারে না। কিন্তু একই চরিত্রের, এক ধরণের গতিসম্পন্ন রেখা সমতল দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্রে নিয়মিত দূরত্বে পৌনঃপুনিকভাবে বিন্যস্ত হয় এবং জমির ছেড়ে দেওয়া অংশেও যদি নিয়মিত বিভাজন লক্ষ্য করা যায়, তখন রেখার চারিত্রিক পৌনঃপুনিকতা ও জমির ফাঁক মিলে একটা ছন্দ তৈরি করে। এই ছন্দই দৃশ্যালংকারের মূল সূত্র, ছন্দের পুনরাবৃত্তিতেই নকশা অলংকার হয়ে ওঠে। পূর্ণেন্দুর কাজের অন্যতম চরিত্রবৈশিষ্ট্য তাদের অলংকারধর্মী, যাতে নিয়মিত ব্যবধানে উপাদানের পৌনঃপুনিক উপস্থাপন বেশ বড় ভূমিকা নেয়। 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর'-এর প্রচ্ছদে বর্ণ, বর্ণান্তর ও বুনটের বৈভব না থাকলে নিয়মিত দূরত্বে রেখার নকশা বোনার খেলা জমত কিনা সন্দেহ জোগায়।

বস্তুত, রং, বর্ণান্তর, বর্ণচ্ছায় এবং রং-রেখায় বুনোট পূর্ণেন্দুর কাজে অত্যন্ত জরুরি সাহায্য জোগায়। পূর্ণেন্দুর রঙিন এবং রীতিমতো বর্ণাঢ্য প্রচ্ছদের তুলনায় একরঙা বা দুরঙা প্রচ্ছদের সংখ্যা রীতিমতো কম। 'অন্ধকার বারান্দা'র মলাটে দেখেছি রং প্রচ্ছদটির পূর্ণ অভিঘাতের জন্য কতোটা জরুরি। এ প্রসঙ্গে আর একটি মলাটের কথা অবধারিতভাবে মনে পড়ে, সেটি 'জীবনান্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা'। সবুজেরই নানা বর্ণান্তরের সাহায্যে, ক্রমান্বয়ে ছোট হওয়া বা বড় হওয়া দূরত্বে বিন্যস্ত নানা প্রস্থের সমান্তরাল সরল রেখা আর নানা মাপের নানা দূরত্বে বিন্যস্ত বিন্দুর সাহায্যে পূর্ণেন্দু প্রচ্ছদটির সমতল জমিতে এমন একটি বুনোট নির্মাণ করেছেন যা যুগপৎ অসীম আকাশের আর জলের গভীরের ব্যঞ্জনা বাড়িয়েছেন।

এবার পূর্ণেন্দুর রূপবন্ধ (মোটিফ) এবং রূপকল্প (ইমেজ) গঠন রীতি নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার। মলাট নকশা, চিত্রালংকরণ (ইলাস্ট্রেশন) বা দৃশ্যালংকরণ যাই হোক না কেন রূপবন্ধ ও রূপকল্প গঠনের ক্ষেত্রে পূর্ণেন্দু বস্তুরূপের প্রতিসরণকে সযত্নে পরিহার করে বস্তুরূপের রূপান্তর ঘটান। রূপান্তরিত রূপটি কিন্তু নির্ভর করে প্রাসঙ্গিকতা ও নকশা অথবা ব্যঞ্জনার সামগ্রিকতার উপর।

ফলে আঙ্গিকগতভাবে তিনি বহু বিচিত্র ধরণের রূপবন্ধও রূপকল্প সৃষ্টি করেছেন। তবে, যত বিচিত্র রূপই তাঁর সৃষ্ট রূপবন্ধ ও রূপকল্প ধারণ করুক না কেন, তাদের রূপ নির্মাণ পদ্ধতির মধ্যে একটা মৌলিক ঐক্য আছে। চিত্রক্ষেত্র পূর্ণেন্দুর কাছে সব সময়েই দ্বিমাত্রিক দেশ।

সেই দেশে বিন্যস্ত প্রতিটি রূপবন্ধ বা রূপকল্প সীমারেখার সংজ্ঞাদ্বারা চিহ্নিত আকারমাত্র। কিন্তু আকারটি বস্তুর সংকেতমাত্র, বস্তুর বর্ণনা বা বিবরণ নয়। আর সব কিছু আলংকারিক বিশদ, মোটেই বস্তুর বিশদের প্রতিনিধি নয়।

পূর্ণেন্দুর রূপবন্ধ ও রূপকল্প মূলত এবং চরিত্রগতভাবে দ্বিমাত্রিক, আকার নির্ভর, সরলীকৃত এবং সাংকেতিক হবার কারণে তাঁর রূপবন্ধ এবং রূপকল্প নির্ভর নকশাগুলির মধ্যে যেগুলি 'স্মৃতির শহর'-এর (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়) মতন বর্ণনাত্মক বা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র মলাটের মতন বিররণ মূলক সেগুলো সার্থকতার শিখরে তেমন উঠতে পারে না। কবি পূর্ণেন্দুর হাতে 'সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত'-এর মলাটের মতন ইঙ্গিতধর্মী এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'চতুর্দশপদী কবিতা'-র মতন আলংকারিক নকশার কাজ ভাল খোলে।

দুটি মলাটের কাজের বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে উপরোক্ত অভিমতটি যথার্থ কিনা, 'সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত'-এ সিন্ধু পরিণত হয়েছে সাতটি সমান্তরাল পুঞ্জ চরিত্রের আনুভূমিক রেখাতে। প্রতিটি পুঞ্জরৈখিক রূপকল্পর উপরিভাগ ঢেউ-খেলানো, নীচের অংশ সরলরৈখিক। প্রতিটি সমান্তরাল রূপকল্পের উপরি সীমান্তের উচ্চাবচতা বিষম এবং প্রতি দ্বিতীয়টিতে সুষম। এই সমান্তরাল রূপকল্পটির প্রতিটি নদী, ঢেউ এবং জলের সংকেতবহ; কিন্তু কোনটি জল, ঢেউ বা জলের বর্ণনা বা বিবরণ দেয় না। সবকটি সমান্তরাল রূপকল্প মিলে একটি আলংকারিক নকশা সৃষ্টি করে। ঠিক তেমনই নদী, ঢেউ, জল-বোধক সমান্তরাল রূপকল্পগুলির উপরিভাগে বিন্যস্ত দিগন্ত-সংকেতবাহী দেশটি বিষম কিন্তু ছন্দোগুণে সম্পর্কিত সমান্তরাল আনুভূমিক পুঞ্জরেখা নকশাটিকে সম্পূর্ণ করে। 'স্মৃতির শহর'-এ পাই শুধু একটি মাঠে পাশাপাশি থাকা, গায়ে গায়ে লাগানো কুটির, বাড়ি, কোঠাবাড়ি, বেড়ার একটা রৈখিক বর্ণনামাত্র। বর্ণনামূলক রূপকল্প বা রূপকল্প সমষ্টি হলেই বর্ণনার স্বার্থে যতটুকু বাস্তবানুগ হতে হয় তা নকশার স্বাচ্ছন্দ্য ব্যাহত করে। রূপকল্প সংকেতধর্মী হলে নকশার প্রয়োজনে তাকে যথেচ্ছ রূপান্তরিত করা সম্ভব। পূর্ণেন্দুর ঝোঁক যেহেতু ছন্দোগুণ সমৃদ্ধ আলংকারিক নকশা নির্মাণের দিকেই, সেহেতু সাংকেতিক রূপকল্পই ওঁর স্বভাবজ রূপবন্ধ।

যদিও বারে বারেই বলেছি বাস্তবমুখী প্রতিবিম্বিক রূপকল্প, সমন্বয়ে গঠিত বিবরণমূলক বা বর্ণনাত্মক নকশার চেয়ে পূর্ণেন্দুর হাতে সংকেতধর্মী রূপকল্প বা অলংকারবহুল রূপবন্ধের সমন্বয়ে নির্মিত ছন্দোগুণসমৃদ্ধ

পূর্ণেন্দু পত্রী/দৃষ্টি সৃষ্টি

পূর্ণেন্দু পত্রী/নীল নির্জন

পূর্ণেন্দু পত্রী/সবীজ পৃথিবী

পূর্ণেন্দু পত্রী/থোড় বড়ি খাড়া

আলংকারিক নকশাই পূর্ণেন্দুর স্বভাবজাত, তবু বলব এর ব্যতিক্রম আছে। ১৩৮৩-র, দেশ, সাহিত্য সংখ্যার প্রচ্ছদের জন্য পূর্ণেন্দু একটি টেবল্-টপ ফটোগ্রাফ করিয়েছিলেন, কয়েকটি বস্তু সমন্বয়ে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটি মুখবন্ধ সুদৃশ্য দোয়াত। তার উপরে একটি ধাতু নির্মিত ঈগল পাখি বসে আছে। আর দোয়াতের সামনে একটি খাগের কলম পড়ে আছে। সময়টা ছিল ইমার্জেন্সির; চালু ছিল প্রেস সেন্সরশিপ। মলাটটি দৃশ্যতই প্রতীকী। ছবিটির প্রতীকী সত্তাই মলাটটিকে বর্ণনাত্মক হতে দেয়নি, যদিও সেটি গঠিত হয়েছিল প্রাতস্বিক রূপকল্পের সমন্বয়ে। দোয়াত আর পাখির গঠনে অলংকারও কম ছিল না।

সব সার্থক শিল্পীর মতনই পূর্ণেন্দুর অনুকরণকারী আর অনুসরণকারীর অভাব নেই। অল্পসল্প ভাবুক গুণগ্রাহী আছেন যাঁরা পূর্ণেন্দুর কাজ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে নিজের কাজকে সমৃদ্ধ করেন। অনুসরণকারীরা পূর্ণেন্দুর আসল কাজের প্রসঙ্গ ও সামগ্রিকতা মনে না রেখেই শুধুমাত্র দৃষ্টিগ্রাহ্য নকশার অংশবিশেষ তুলে নিয়ে কাজে লাগান, আর অনামা অনুকরণকারী চৌর্যের দায় এড়ানোর জন্য। পূর্ণেন্দুর নকশা নিয়ে তাকে বোকার মতন এমনভাবে বদনাম করা হল যে তাতে আসল নকশার সৌন্দর্য আর থাকে না। এ-প্রসঙ্গে বর্তমান লেখকের একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে। ১৯৬০-এ পূর্ণেন্দু বর্তমান লেখকের বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রটি তৈরি করে দিয়েছিলেন। সে ঘটনার বছর দুয়েক পরে কোনও একটি বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র হাতে পেয়ে মনে হল নকশাটি পরিচিত। মিলিয়ে দেখতে গিয়ে দেখলাম, দ্বিতীয় পত্রটি মূলত পূর্ণেন্দুর তৈরি নকশার মতন, কিন্তু পূর্ণেন্দুর নকশায় যেখানে ছিল রেখা দ্বিতীয়টিতে সেখানে এসেছে পুঞ্জ, আর পূর্ণেন্দুর নকশায় যেখানে ছিল পুঞ্জ সেখানে এসেছে রেখা। একাজ করে হয়তো অনামা দ্বিতীয় নকশাকার চৌর্যের ব্যয়ও কিঞ্চিত কমিয়েছিলেন কিন্তু পূর্ণেন্দুর কাজে যে সূক্ষ্মদ ভারসাম্য নকশার সৌন্দর্যকে ধরে রেখেছিল তা দ্বিতীয়ের আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল।

পূর্ণেন্দু শেষাবধি অত্যন্ত সক্রিয় এবং সৃজনশীল ছিলেন। প্রচুর কাজ করেছিলেন এবং তার চেয়েও বেশি কাজ করার ক্ষমতা রাখতেন। তাঁর কাজের চাহিদাও সমানে বাড়ছিল। পূর্ণেন্দু পত্রী ফিল্মও তৈরি করেছিলেন যা ছিল তাঁর প্রচ্ছদের মতোই সমান্তরাল।

(সংক্ষেপিত)

ধ্রুব এষ : দু'বাংলার সালভাদর দালি

অদ্রীশ বিশ্বাস

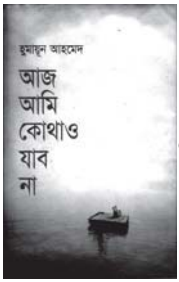

ধ্রুব এষ/আজ আমি কোথাওও যাব না

বাংলা প্রচ্ছদে সুররিয়ালিজমের প্রবর্তক ধ্রুব এষ। যদিও অনেক দেরি হল এই লক্ষণ আসতে কিন্তু দেরিতে হলেও যা ঘটেছে তার মূল্য অসীম। কারণ, নামি থেকে আমজনতার প্রচ্ছদে এই ফরাসি চিত্রকলার ধর্মটা, আন্দোলনের প্রভাবটা ধরা পড়েছে। উনিই সম্ভবত দুই বাংলার সবচেয়ে বেশি প্রচ্ছদ শিল্পীর রেকর্ডের অধিকারী। একটা সাক্ষাৎকারে বলেছেন শুধু একুশে বইমেলা উপলক্ষে যে বই বের হয় বাংলাদেশে তাতে প্রায় ৬০০ থেকে ৭০০ প্রচ্ছদ উনি বানান। এটা আর কেউ কখনও মানসিক ও শারীরিকভাবে করতে পারেননি। এই অসম্ভব ঘটনাটা প্রত্যেক বছর তিনি ঘটান। আর তার সঙ্গে ওঁর কাজে একটা মান থাকে, একটা বুড়ো আঙুলের ছাপ থাকে, নিজস্বতা, আইডেনটিটি, যেটা উনি ধারাবাহিকভাবে মেনটেন করেন। তো, সেই আইডেনটিটি বা সুররিয়ালিজম ধর্মটা সমস্ত পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। তিনি সেই ধারাটা সম্পর্কে জানুন বা না জানুন। এর ফলে একধরনের শিল্প-শিক্ষায় শিক্ষিত করেন ওর প্রচ্ছদের মধ্যে দিয়ে। উনি দেখান কীভাবে একটা ফরাসি চিত্রকলা চর্চার ছবিগুলো বাংলার বইতে বাংলাদেশের হয়ে গেছে। তাই ওঁর ছবির প্রতি মানুষের এত ভালবাসা বা টান। এবার আমরা আলোচনা করব এটা কীভাবে ঘটল।

ধ্রুব এষ/আসমানীরা তিন বোন

সালভাদর দালির চিত্রকলা ও ফটোগ্রাফিতে টান ছিল। যাঁরা ছবির চর্চা করেন, তাঁরা জানেন কীভাবে এই মহান শিল্পী এই দুর্দান্ত সব ফটোগ্রাফির খেলায় মেতে সুররিয়ালিস্ট ফটোগ্রাফের জন্ম দিয়েছেন। অনেকে ভাবেন ফরাসি ফটোগ্রাফির মন রে সুররিয়াল ছবি তুলেছেন একমাত্র। তা নয়। অন্তত সালভাদর দালির ক্ষেত্রে নয়। তিনি এমন কিছু ছবি তুলেছেন যেমন এক বালতি জল ছোড়া হচ্ছে, সঙ্গে উল্টোদিক থেকে একটা বেড়ালকে শূন্যে ছোড়া হচ্ছে। কিংবা একটা বেড়ালকে বাঘের মতো ডোরাকেটে তিনি মেরে দিয়েছেন বাস্তবে ওইদিন কোনও পার্টিতে গিয়ে। এই ছবিটাও দেখা যায়। আর তার নানা মুখের ভঙ্গির ফটোগ্রাফ বিখ্যাত সুররিয়াল ফটোগ্রাফ হিসাবে। এই ফটোগ্রাফ চর্চা নিয়ে অবতারণার কারণ সুররিয়ালিজমের সঙ্গে টেকনোলজির যোগ আছে। এটা শুরু হয়, তার আগের ডাডা ইমেজের মধ্যে দিয়ে। তার পর ওঁরাই কনভার্ট করেন সুরিয়ালিজমে। কারণ, এর আগে যখন শুধু চিত্রকলার যুগ ছিল তখন তারা ছবি এঁকেছেন। তার পর যখন ক্যামেরা এল, তখন বহুদিন দর্শনটাই ছিল ফটোগ্রাফ এত বাস্তবতাকে ধরতে পারে যে তার

ধ্রুব এষ/বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল

ধ্রুব এষ/চলে যায় বসন্তের দিন

ধ্রুব এষ/একজন মায়াবতী

ধ্রুব এষ/সে আসে ধীরে

ধ্রুব এষ/হোটেল রোয়ান

দরকার নেই বাস্তবতাধর্মী চিত্রকলার। ফলে, চিত্রকররা অন্য বাস্তবতার খোঁজে ব্যস্ত হলেন। শুরু হল আধুনিক চিত্রকলার কাল, যেখানে ফটোগ্রাফ নেই, তার দর্শন নেই, সে বরং ক্যামেরাকে ক্রিটিক করে নিজের ভাষ্য গড়ে তুলতে লাগল। এই বিশ্বাসটা চ্যালেঞ্জ হল ডাডাইজমে প্রথম, তারপর আরও বড় করে সুররিয়ালিজমে। ফলে সুররিয়াল ছবিতে এমন সব উপাদান থাকে যা অনেকটা বাস্তব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাবাস্তবতার দর্শনে রিচ করে। একটা ঘড়ি গলে পড়ছে। ঘড়িটা আঁকা একদম বাস্তবভাবে, কিন্তু সময় গলন্ত। জ্বলন্ত জিরাফ। জিরাফ আঁকা হুবহু জিরাফের মতো। কিন্তু তার অবস্থা পরাবাস্তব জ্বলে যাওয়া। এই দুটো দালির ছবির নিদর্শন। ওঁদের বন্ধু পরিচালক লুই বুনুয়েল সুররিয়াল সিনেমাও বানান। সবাই মিলে বের করতেন সুররিয়াল পত্রিকা, ম্যানিফেস্টো ছাপা হত। আর এইসব কাজের নমুনা। এখন এই টেকনোলজি কেন্দ্রিক শিল্পচর্চার, যে ধারা, তার প্রধান পুরুষ কিন্তু দালি, যাঁর ছবির সার্থক প্রভাব আছে ধ্রুব এষের কাজে।

ধ্রব এষ কী করে তাঁর অসাধারণ মেধায় একটা খোলা দরজার বাইরে বাংলাদেশের গাছ, নদী, মেঘ, চাঁদ, পাখি, সূর্য ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। এতদিন এতগুলো ব্যবহার হয়েছে বাস্তবতায়, ধ্রুব যখন আঁকছেন তখন তা অসম কিছুর সঙ্গে বসে একটা আলাদা পরাবাস্তব মাত্রা এনে দিল। ফলে, ওঁর ছবি বাংলার চেনা প্রকৃতিকে ধারন করে দর্শকপ্রিয় হল। হাওয়াতেই হবে, যদি সেটা বিদেশিই থেকে যায় তাহলে শিল্পী ব্যর্থ। ধ্রুব এষ তা নন। তিনি মস্তিস্ক খাটিয়ে এই পরাবাস্তবতায় বাংলাদেশ বসান। এখানে বাংলাদেশ শব্দটা দুই বাংলা অর্থে, যেহেতু এই উপাদানগুলোর মধ্যে কোনও তফাৎ নেই। অনেক সময় এই বিদেশি চিহ্নটা থেকে যায়। তার দাম থাকে না। যদি বাংলাদেশের প্রচ্ছদের ইতিহাস দেখা যায়, তাহলে কিন্তু তাতে এই বিদেশি চিহ্ন বা শেকলটা ছিল। ধ্রুব এষ এসে এটা বিশালভাবে ভেঙে দেবে। তিনি বাংলার উপাদান ঢোকান, বাংলার রেখা তাঁর ছবিকে অন্য মাত্রা দিল। রেখা কীভাবে? তাঁর ছোটদের বইতে আঁকা ছবিতে যে রেখা ব্যবহার হয় সেটা কারও বিদেশি শিল্পীর নকল নয়, সেখানে এমন কি জয়নাল আবেদিনও নেই, কাইয়ুম চৌধুরীও না। এটা একদম নিজের কাজ। সেখানে, অনেক সময় তিনি সুররিয়াল নন, হয়তো কখনও কার্টুনের প্রভাব তাতে আছে কিন্তু কোনওভাবেই তার বাবা-ঠাকুরদার নাম বলা যাবে না। সেটা একটা আলাদা আলোচনা দাবি করে। এখানে সেটা ছুঁয়ে যাওয়া হল কেবলমাত্র। আমরা যেহেতু ওঁর প্রধান লক্ষণগুলো নিয়ে আলোচনা করছি, তাই এই দালিময়তা নিয়ে আমাদের কথাবার্তা।

তিনি বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদে আরও একটা বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটিয়েছেন। সেটা হল, এতদিন ছিল বইয়ের যে বিষয়বস্তু সেই অনুসারে

প্রচ্ছদ নির্মাণ। উনি এটা ভেঙে দিয়েছেন। এটা সবচেয়ে বেশি করার সুযোগ পেয়েছেন হুমায়ুন আহমেদের বইয়ের প্রচ্ছদে। যে সুররিয়াল ছবির কথা বললাম, একটা দরজা, বাইরে ঘড়া, এইরকম অসংখ্য পরাবাস্তব অনুসঙ্গের সঙ্গে উপন্যাসের কাহিনির কোনও যোগ নেই। হয়তো কাহিনিটা পাশপোর্ট করানো নিয়ে অথবা ভিখারির জীবন নিয়ে। এই যে কাহিনি বা বিষয়বস্তু তা থেকে মুক্তি এটা কিন্তু বাংলা প্রচ্ছদে প্রথম ধ্রুব এষ করেন। অর্থাৎ, প্রচ্ছদ মুক্ত হল। তাতে কী হল? তাতে, প্রচ্ছদ আলাদাভাবে শিল্প হয়ে উঠতে অনেক বেশি জোর পেল। এর আগে শিল্পী তার ভাবনাকে বাঁধতেন বইয়ের কাহিনিতে। এবার ধ্রুব এসে সেটা উল্টে দিলেন। তাঁর প্রচ্ছদ স্বাধীন, বইয়ের বিষয়ও স্বাধীন। এতে তিনি প্রচুর নিজের পছন্দ মতো প্রচ্ছদ করার সুযোগ পেলেন। এই পছন্দটা প্রধানত পরাবাস্তব ছবির চর্চা। ফলে, পাঠক আগে ধ্রুব এষের প্রচ্ছদ দেখে তার মনে একটা প্রতিক্রিয়া হল, যা স্বাধীন, তার পর বইয়ে ঢুকেছেন, বইটা পরে আসছে তার ভাষ্য নিয়ে বা বয়ান নিয়ে, সেটাও স্বাধীন। এবার দুটো ভাষা মিলে একটা তৃতীয় ভাষ্য বা 'টেক্সট' তৈরি হল, যার অর্থ আলাদা। এমনটা এর আগে বেশি হয়নি। আর এটা ধ্রুব এষ এসে এত অজস্র প্রচ্ছদের মধ্যে দিয়ে এই নতুন ভাষ্য রচনার ঘটনাটা মুহুর্মুহু ঘটালেন। এটা সবচেয়ে বেশি পাওয়া যাবে হুমায়ুন আহমেদের বইতে। কেন এটা হল? কারণ হুমায়ুন আহমেদের একটা ভরসার জায়গা ছিল ধ্রুব'র কাজ। আর তিনি নিজে যেহেতু এক সময় বিদেশে থেকেছেন। তিনি তাই জানেন এইসব শিল্পচর্চার ধারাগুলো সম্পর্কে। নিজে সেই জন্য মুক্তমনা হতে পেরেছেন। এটা খুব জরুরী। সঙ্গে তার লেখা উপন্যাসগুলোর কয়েক লক্ষ পাঠক, যাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে ধ্রুব এষের কাজ। পরাবাস্তবতার ছবিগুলো, যা স্বাধীন করল বাংলা প্রচ্ছদকে। এটা একটা বড় ঘটনা। যদি হুমায়ুন আহমেদের মতো লেখক না থাকতেন, তাহলে এত জনপ্রিয় হতেন না ধ্রুব এষ। একাই একটা মানুষ তার প্রচ্ছদ দেখছে প্রিয় লেখকের বইতে। আর সেই বইয়ের সংখ্যাও প্রচুর। এটাও একটা বড় ব্যাপার। যদি হুমায়ুন আহমেদ অত না লিখতেন, তাহলে তাঁর অল্প বইয়ের মধ্যে দিয়ে এতটা সাফল্য পেতেন না ধ্রুব। হুমায়ুন আহমেদ নিজেই বলেছেন, আমি আমার পাঠক সংখ্যা বাড়িয়েছি। সঙ্গে একাধিক উপন্যাস বা বই একই মেলায় বের হল ধ্রুবর প্রচ্ছদসহ। এই সংখ্যা বৃদ্ধি অনেক সময় প্রচ্ছদের মান নষ্ট করে। এখানে উল্টো হয়েছে। কারন, ধ্রুব'র করা প্রচ্ছদগুলোর জন্য উপন্যাস বা গল্পগুলো পড়তে হয়নি। সেটা একটা অসম্ভব ব্যাপার, যদি একই বছরের মেলায় ছয়শো-সাতশো প্রচ্ছদ বানাচ্ছেন তিনি। ফলে এই স্বাধীনতা নেওয়াটা, না পড়ে প্রচ্ছদ বানানো ছাড়া উপায় নেই। তিনি তার ফলে আরেকটা বিপ্লব ঘটালেন বাংলা প্রচ্ছদে। কম্পিউটারে

ধ্রুব এষ/লীলাবতী

ধ্রুব এষ/লিলুয়া বাতাস

ধ্রুব এষ/মিসির আলি! আপনি কোথায়?

ধ্রুব এষ/নন্দিত নরকে

প্রচ্ছদ বা ছবি এখন সবাই করে। কিন্তু ধ্রুব এষ পরাবাস্তব ছবিগুলোকে কম্পিউটারে করলেন। এটা নতুন। যে জন্য আমরা সুররিয়ালিজমে টেকনোলজি ছিল এটা বলতে চেয়েছি। তো সেই টেকনোলজিকে সরাসরি পেইন্টিং হিসাবে ব্যবহার করলেন তিনি। যে ঘড়ি, জিরাফ, মেঘ, জানালা বাস্তবের মত এঁকেছিলেন দালি; সেই উপাদানগুলোর আর প্রায় না এঁকে ধ্রুব ওগুলোকে বাস্তব ফটোগ্রাফ থেকে নিলেন, তারপর ফটোশপে বসিয়ে এডিট করে একদম টেকনোলজি নির্ভর প্রচ্ছদ তৈরি করলেন। ফলে, পরাবাস্তবতাকে ধ্রুব টেকনোলজির মধ্যে দিয়ে আনলেন। আর এটা করার কারণ, প্রচুর পরিমাণ প্রচ্ছদ করার চাপ, বাধ্যতা ও রুটিরুজি। এছাড়া তাঁর অন্য উপায় নেই। কিন্তু শিল্পী যদি মধ্যমেধার হতেন তাহলে হেরে যেতেন। ব্যর্থ হত তার কাজ, বা রিপিটেটিভ হত। যেহেতু ধ্রুব মেধাবী, ওঁর লেখা পড়লে যেটা আর এক ভাবে টের পাওয়া যায়, তাই ধ্রুব এই বিশেষ ঘটনাটায় সাফল্য পেলেন।

পরাবাস্তবতায় স্বপ্নর একটা বড় ভূমিকা আছে। ধ্রুবর ছবিতে সেই স্বপ্নময়তা আছে। যাকে অনেকে কবিতার মত ছবি বলেন। এটা ধ্রুবর ছবির ভেতরে আছে। কিন্তু কবিতা-কেন্দ্রিক ছবি অনেক প্রচ্ছদশিল্পীর কাজেই থাকে। যদি সেই শিল্পী নিজে কবি হন, তাহলে তার কাজে সেই ছাপ থাকে। যেমন, পূর্ণেন্দু পত্রীর নানা প্রচ্ছদ। হয়তো সত্যজিৎ রায়ের ছবিতেও এই লক্ষণ অনেক সময় দেখা যায়। তাই সেটা কোনো বৈপ্লবিক ঘটনা নয়। ধ্রুব এষ যা করেছেন, সেটা বৈপ্লবিক। পরাবাস্তবতায় কাব্যিকতা এনেছেন। ফলে ওঁর কাজ অন্যদের চেয়ে পৃথক হয়ে গেছে। ওঁর পরাবাস্তবতা ওঁকে পৃথক করেছে।

বই বিষয়টা হয়তো আগামী কুড়ি-পঁচিশ বছরের মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়বে। বাংলাদেশে হুমায়ুন আহমেদের মৃত্যু একটা বড় বাজারের জায়গাকে নষ্ট করলো। হুমায়ুন আহমেদ, হুমায়ুন আহমেদ করছি বলে আমি আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের পাঠক নই, তা নয়। আমার গবেষণার বিষয় ছিল জনপ্রিয় সংস্কৃতি– জনপ্রিয় সাহিত্য, তাই তার পর্যবেক্ষণটা সবসময় কাজ করে, কীভাবে জনসাধারণের চাহিদা ও রুচি পরিবর্তিত হয়, নিয়ন্ত্রিত হয় বাজার দ্বারা। অথবা 'বাজার' বলতে আমরা এখন বইয়ের দোকানের বাইরে আর কি কি বুঝব। যা আমাদের নিয়ন্ত্রিত করছে। তাহলে, যদি বাংলা বইয়ের বাজারের একটা অংশ যদি হুমায়ুন আহমেদের মৃত্যুতে শেষ হয়, তাহলে ধ্রুব এশের কাজের যে বিশাল বড় ভাবে ছড়িয়ে পড়া ও জনপ্রিয় হওয়া সেটা এখন প্রশ্নচিহ্নের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। এবার সেই বুমটা হয়ে গেছে। এখন বই যদি না থাকে, তাহলে ক্রমশ অন্য কোনও ভাবে ধ্রুবর কাজ, তাঁর বাজারকে বিকল্প রূপদানের দিকে নিয়ে যেতে হবে। কারন, তিনি একজন এমন শিল্পী, যিনি আর এক ভাবে ইন্ডাস্ট্রিও। তাহলে মেধাবী ধ্রুব এষকে ভাবতে হবে কীভাবে তিনি দুই বাংলার সালভাদর দালি হয়ে জ্বলন্ত জিরাফের ঘাড়ে চড়ে উঠতে পারেন, নতুন কোনও শিল্প বিপ্লবের আশায়।

স্বাদ সঞ্চয়িতা

সামরান হুদা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ - মাহ্‌বুবুর রহমান

দাম ৫৫০ টাকা

এই প্রথম বাংলা ভাষায় লেখা হল ফুড অ্যান্থ্রোপলজি বা খাদ্য নৃতত্ত্বের বই। আত্মসমালোচনার আয়নায় 'অন্য'কে দেখার রাজনীতি নিয়ে কথা বলে নৃবিজ্ঞান। এই 'অন্য' ক্রমশ হয়ে ওঠে লেখকের ঋজু কণ্ঠে প্রান্তিকের স্বর, যা ধ্বনিত হয় সমকালীন সামাজিক ইতিহাসে। স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র অথবা সমগ্র সভ্যতার ইতিহাস যখন দখলদারীর বয়ান তখন সামরান লিখছেন তার নিজস্ব দেশগাঁয়ের স্বাদকাহন এক নিভৃত আলাপচারিতায়। গৃহকর্মে নিপুণা, রন্ধনশিল্পে পটু কিছু চরিত্রের খোঁজে উড়াল দিয়ে ধরে আনা অলীক স্বাদের যত উদাসীন, বৃক্ষপাগল, জলজ বদ্ধ উন্মাদ, বাজীকর ওঝা, ভুলে যাওয়া রান্নার খাতালেখা অন্তঃপুরবাসিনীর কথা। অতিপরিচিত অথচ অন্য, সামরানের আশৈশব দর্শনসঙ্গী এইসব মানুষের প্রতিবিম্ব যেন স্বকীয় করপুটের মতোই অদেখা, অজানা। একই সঙ্গে এই বই নারীর বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান সহিংসতা বোঝা ও মোকাবিলা করার আখ্যানও। এই বই খেত-খামারে ঘুরে বেড়ানো মানুষের, যাদের মাঠঘাটের ধুলোয় সাতরঙা সতরঞ্চির মতো বর্ণিল চড়ুইভাতি বা নিছকই রান্নাবাটি খেলার দিনগুলির ওপর জলছবি হয়ে ফুটে উঠেছে সামরানের অনাচ্ছাদিত চোখে সাধারণীর ইতিহাস, মানুষকেন্দ্রিক সমাজসভ্যতার এক মরমী গভীর, নিজস্ব পাঠ।

এই পুর্ননির্মাণের পথচলায় সামরানের নৃতাত্ত্বিক সফরসঙ্গী শিল্পী মাহ্‌বুবুর রহমান। কাঁটাতারের দু'পাশে বসে দুইজন আঁক কাটলেন ছয়রসের স্মৃতির সংসার। গড়ে উঠল এক অনন্য সংবহ, অপূর্ব সঞ্চয়নের আশ্চর্য আস্বাদকথা।

খ্যাটন সঙ্গী

দামু মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ - স্মারক রায়

দাম ৫০০ টাকা

খাইয়ে হিসেবে বাঙালির দেমাক খুব। চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়র এমন সমঝদার না কি ভূ-ভারতে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আবার ভ্রমণের নেশাও তার বিস্তর। পর্যটকের সফর পরিকল্পনায় 'ফুড ট্যুরিজম' বা রসনার খোঁজে বিশেষ ভ্রমণ তুলনামূলক নতুন কনসেপ্ট। কোনও বিশেষ সুখাদ্যের সন্ধানে পাহাড়-জঙ্গল-মরুভূমি-সাগর চষে ফেলা কিংবা ভিনরাজ্যে গিয়ে নিত্যি মাছ-ভাতের ঠিকানা জরিপ না করে সে তল্লাটের হেঁশেলেই উঁকিঝুঁকি মারা বাঙালির জীবনে নতুন। সাবেক রসনাবিলাসের তত্ত্ব-তালাশে মগ্ন বান্দার হদিশ সহজে মেলে না। বাংলা সাহিত্যে 'ফুড ট্যুরিজম' বিশেষ চর্চিত বিষয় করে তোলার পরিকল্পনাতেই তৈরি খ্যাটন সঙ্গী।

কথায় বলে, গতস্য শোচনা নাস্তি। তাই চেনা গৎ ছেড়ে শুধু জিভের বালাই মেনে অদেখা যাত্রাপথের সন্ধান এই কেতাবে। ছপ্পন ভোগ না সাড়ে বত্রিশ ভাজা, আপনার পছন্দ যাই হোক এখন থেকে বাঙালির প্রতিটি সফরে খ্যাটন সঙ্গী আবশ্যক।

সুরের গুরু ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ

শোভনা সেন

সম্পাদনা - অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট - চিত্রনিভা চৌধুরি

দাম ২২৫ টাকা

'সুরের গুরু ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায়, ধারাবাহিক ভাবে ১৯৫৬ সালে। শোভনা সেন আলাউদ্দীনের সঙ্গে দেখা করতে যান আলাউদ্দীনের তৎকালীন জামাই পণ্ডিত রবিশঙ্করের দিল্লির বাড়িতে। আলাউদ্দীনের শিল্পসত্তা ছাড়াও মানুষ আলাউদ্দীনকে পাওয়া যায় এই লেখায়। শোভনা লিখেছেন ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর উদারতার কথা। হিন্দু বা মুসলিম কোনও ধর্মের গণ্ডিতেই মাপা যায় না তাঁকে। সঙ্গীত সাধনা ও ভগবত আরাধনা কোথাও যেন মিলে মিশে সময়ের সীমারেখা পার করে তাঁকে বানিয়েছে সুরের গুরু। এযাবৎ অগ্রন্থিত ধারাবাহিকটি নতুন করে ছাপা হল এই সঙ্কটকালে যখন উদারতা শব্দই প্রায় লোপ পেতে বসেছে যুগমানস থেকে। সম্পাদক অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ করেছে প্রাসঙ্গিক তথ্য ও একটি সম্পূর্ণ নতুন লেখা। বইটিতে সংযোজিত হয়েছে আলাউদ্দীনের লেখা দুষ্প্রাপ্য কতগুলি চিঠি।

পাখালিনামা

রূপঙ্কর সরকার

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও নকশা - ময়াঙ্ক রাই

দাম ৪৫০ টাকা

সৌন্দর্যায়নের ঠেলার কলকাতা এখন গ্রীন ডেজার্ট। প্রায় চার দশক আগে থেকেই আলিপুর চিড়িয়াখানার পথ মাড়ায় না পরিযায়ী পাখির দল। লবণহ্রদে একসময় খেলত বিদ্যাধরীর জোয়ার, মাছের লোভে কাতার দিত পাখি। সখের শিকারীরা সেসব শেষ করে দিয়েছেন অনেকদিন, অবশিষ্ট মুছেছে নগরায়ন। ধীরে ধীরে পাখি শূন্য হচ্ছে কলকাতা।

কী হবে পাখি দিয়ে? ছড়ায়, গানে, ধর্মে, লোকগাথায় পাখিদের উল্লেখ যুগ যুগ ধরে। সাহিত্য বা বিনোদনের বাইরেও পাখির ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে 'পাখালিনামা'য়। শস্য উৎপাদনে ফুলের পরাগমিলন থেকে বীজ প্রসারণ। কীটনাশকের কাজও করে থাকে পাখিরা। এ বইয়ে আছে শহরের ঝাড়ুদার পাখিদের কথা, এমনকি মাছের নিষিক্ত ডিম বন্টনে পাখিদের অপরিহার্য ভূমিকার কথা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার তারাজুতে পাখিদের সংকটকে মেপেছেন লেখক পরিবেশের বিপন্নতার এককে। শুনিয়েছেন সেই অমোঘ কথা, পাখি না থাকলে কেমন করে মানুষও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে একদিন।

আইটি আইটি পা পা

যোষিতা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ - একিও ওজালা

দাম ৪৫০ টাকা

১৯৯১ তে ভেঙে গেল সোভিয়েত ইউনিয়ন। ৯১, ৯৩, ৯৪— ডিমনিটাইজেশন, দেশের অর্থনীতির হাল বেচাল, চলছে বিনিময় প্রথা। ছাত্রজীবনের দশটা বছর উজবেকিস্থানে কাটিয়ে ইঞ্জিনিয়ার মেয়ে ১৯৯৫-এর শেষে কলকাতায় ফিরলেন সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে। অসমবয়সী প্রেমিকটি অল্পদিন পরই চম্পট। সিঙ্গল মাদারের ঠাঁই হল না নিজের পরিবারে। শুরু হল নিঃসঙ্গযাপন, চাকরি খোঁজা।

নব্বই-এর কথামালায় তখন নতুন ভাষা যোগান দিচ্ছে কম্পিউটার। দলে দলে মানুষ আসছে, সেই সব ভাষা শিখতে। গজিয়ে উঠছে ট্রেনিং ইন্সটিট্যুট। প্রথম চাকরি হল সেখানে। পরপর চাকরি বদল। কখনও ট্রাভেল এজেন্সি কখনও বিজ্ঞাপন সংস্থায়। এ বইতে আছে কেবলমাত্র চারটে চাকরির গল্প। যার শেষ ওয়াইটুকে সমস্যা কাটিয়ে ডানা মেলা আইটি সম্ভাবনার বিকাশে। এই আত্মকথন আবার এক জনমদুখিনী মায়ের। বহতা জীবনের গল্পে কোথাও যেন মিশে আছে চিরায়ত ঠাকুরমার ঝুলির অনুরণন। 'মায়ার পাহাড় মায়ায় ঢাকা/মায়ায় মারে তীর—/এ সব যে আনতে পারে/সে বড় বীর।'

সাত ঘাটের জল

শঙ্খ কর ভৌমিক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ - মৃন্ময় দেববর্মা

দাম ২৫০ টাকা

কখনও কখনও কারও কারও সঙ্গে এমন হয়। সামান্য মানুষকেও বেছে নেয় কিছু অসামান্য অভিজ্ঞতার জন্য। চলার পথে পালটে পালটে যাওয়া দৃশ্যপট, যেন ম্যাজিক। দেশভাগের অনেক অনেক পরে জন্মেও কারও থাকে এক নিজস্ব দেশ, গ্রাম, মনের আলিসের ব্যক্তিগত ওয়ান্ডারল্যান্ড, নিজস্ব লবটুলিয়া। শঙ্খ কেমন করে লিখে ফেললেন এই প্রজন্মের বাতিল কিছু দীর্ঘশ্বাস! একরত্তি মফঃস্বল শহরের শৈশব, ভুল করে পড়া ইঞ্জিনিয়ারিং, জীবিকার প্রয়োজনে চষা বনবাদাড়, পদে পদে ঠোক্কর আর উঠে দাঁড়ানো মানেই চাকরি-বদল, সাত ঘাট ঘুরে ঘুরে অয়নপথে পরিক্রমা।

শিল্পী তার বেদনার আত্মঘাতী রঙে যখন এঁকে ফেলেন হারানো রোমন্থনের সিন্দুক তখন চিৎকৃত হয় এক স্বকীয় প্রতিবাদ। একদিকে শিল্পী মৃন্ময় দেববর্মা উড়াল দিলেন সুবচনীর খোঁড়া হাঁসের পিঠে চেপে, তরঙ্গমালায় ঘুঙুরের শব্দ, গন্তব্য হৃদয়প্রদেশ। এ যে সাত ঘাটের রঙিলা জল, এক বিহ্বল পাঠ, যা মানুষ বারে বারে পড়ে চলে সারা জীবন।

রমণীয় দ্রোহকাল

রঞ্জন রায়

প্রচ্ছদ - সুমেরু মুখোপাধ্যায়

দাম ৪০০ টাকা

ষাটের দশকের শেষ। দু'বছরের অন্তরালে দুই পড়শি দেশের সঙ্গে দুটো যুদ্ধ। খাদ্যদ্রব্যের দামে আগুন, চাকরির বাজারে মাছি ভনভন। সেই মলিন ক্ষয়া নষ্টচন্দ্রের সময়ে জ্বলে উঠেছিল একটি আগুনের ফুলকি, বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ। আমরা জানলাম— বন্দুকের নলই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস। আগুন নিয়ে খেলতে গিয়ে অনেকের হাতই পুড়ল। কিন্তু এ হল তুষের আগুন। সহজে নিভল না।

এই বইয়ের সময়কাল নব্বইয়ের দশক যখন সত্তরের রণক্লান্ত নকশালরা ছত্রভঙ্গ। এই রক্তাক্ত গাজনে চাপা পড়েনি উমার অবসাদ। নারীর আপাত-অবহেলিত কণ্ঠ ধরা দিয়েছে কয়েক টুকরো ডায়রির পাতায়। সূত্রধার এক কাল্পনিক কথোপকথন রচনা করেছেন বিপ্লবের সঙ্গে। রমণীয় দ্রোহকাল চেষ্টা করেছে শিবকে ছেড়ে উমাদের কথা বলতে; বাম-র‍্যাডিক্যাল আন্দোলনের ভিতরে পিতৃতন্ত্রের থাবার করাল রূপকে আঁকতে। বইটির আখ্যানভাগের শেষে রয়েছে নকশাল আন্দোলনের রূপরেখা, কালপঞ্জী এবং নেতৃস্থানীয়দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বর্তমান সময় পর্যন্ত।

৯ঋকাল বুকস্

আগামী প্রকাশনা

জীবন-মৃত্যু (আত্মজীবনী)

অসীম রায়

সম্পাদনা - রবিশংকর বল, কুশল রায়

ঝরা সময়ের কথকতা

হিরণ মিত্র

চিকিৎসা সার্কাস

চিকিৎসা অপ্রয়োজনীয় হোক

ডাঃ গৌতম মিস্ত্রী

সম্পাদনা - ডাঃ কৌশিক দত্ত

টুকি-টাকী

সীমা গঙ্গোপাধ্যায়

সঙ্গে আসছে আরও অন্যান্য চমক

প্রাপ্তিস্থান

আমাদের বই পাবেন দেজ, ধ্যানবিন্দু, অভিযান ও কলেজস্ট্রিটের অন্যত্র।

বিশদ জানতে মেল করুন lyriqal.books@gmail.com এ।

৯ঋকাল বুকস্

২০১৭ কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত

স্টল নং - ২৩৬

খ্যাটন সঙ্গী

দামু মুখোপাধ্যায়

স্মারক রায় চিত্রিত

পাখালিনামা

রূপঙ্কর সরকার

স্বাদ সঞ্চয়িতা

সামরান হুদা

মাহ্‌বুবুর রহমান চিত্রিত

সাত ঘাটের জল

শঙ্খ কর ভৌমিক

মৃন্ময় দেববর্মা চিত্রিত

রমণীয় দ্রোহকাল

রঞ্জন রায়

আইটি আইটি পা পা

যোষিতা

একিও ওজালা চিত্রিত

সুরের গুরু ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ

শোভনা সেন

সম্পাদনা - অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়